ব্লু লেগুন

মূল: এইচ দ্য ভের স্ট্যাকপোল

রূপান্তর: মামনুন শফিক

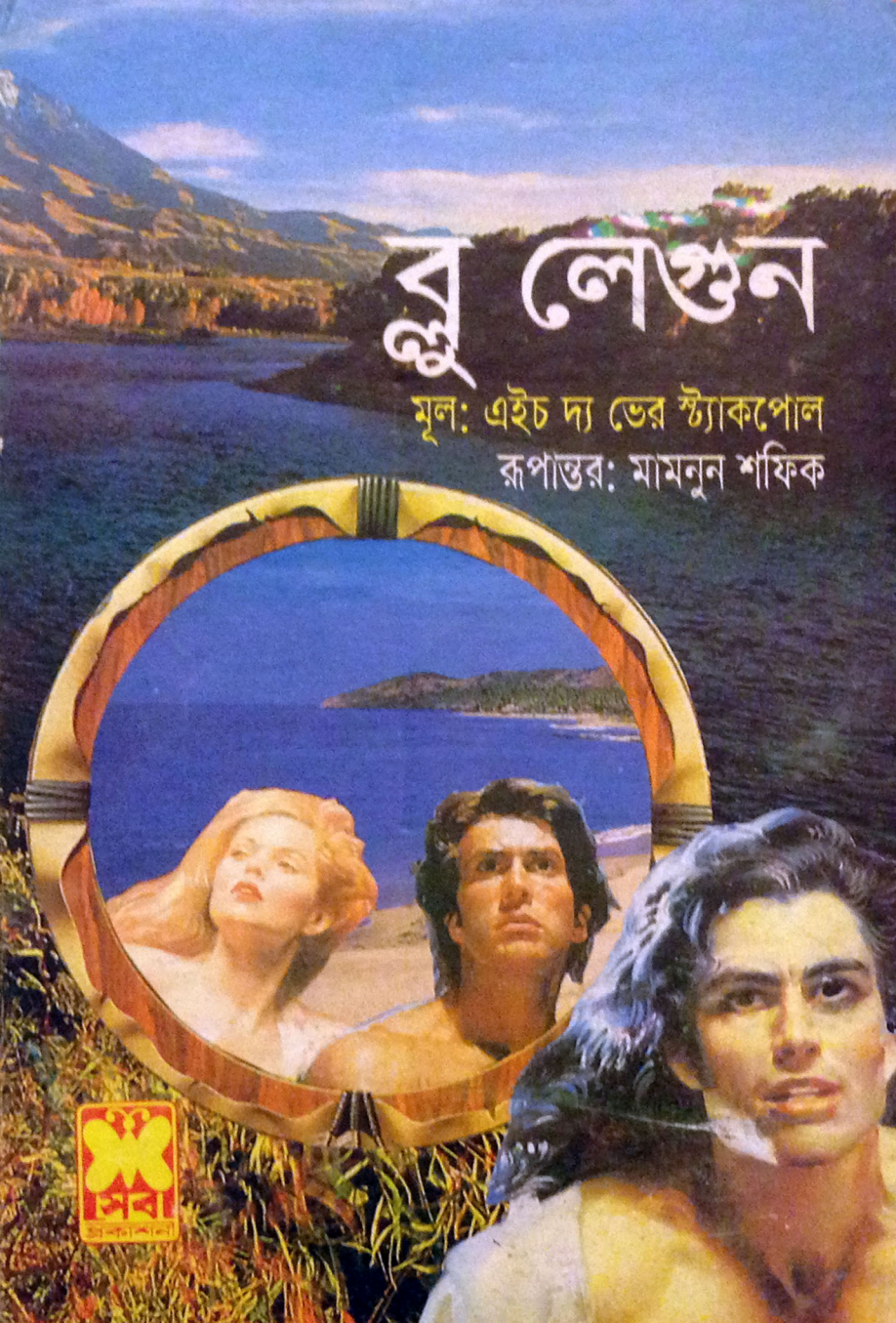

সেবা প্রকাশনী

এক

'প্যাট্রিক!' বাঙ্ক থেকে ঘুমজড়ানো একটা কণ্ঠ ভেসে এল, 'কী একটা গাঁজাখুরি গপ্পো ঝাড়ছিলে তখন?'

'কোন্ গপ্পো?' ওপর দিকে বাঁকা চোখে তাকাল বাটন, কণ্ঠে স্পষ্ট বিরক্তি।

'ওই যে। সবুজ মত কী একটা?'

'ওহ্-হো,' হঠাৎ খুশি হয়ে উঠল বাটন। 'লেপ্রিকুন? আইরিশ পরীর কথা বলছ? আমার আমার বোন একবার দেখেছিল, দাঁড়াও–' কপালে তর্জনী ঠেকিয়ে টোকা দিল বাটন দু'তিনবার, 'হ্যাঁ, মনে পড়েছে, কনটে গায়ে।'

'দেখতে কি রকম ওটা?' ডাচ কণ্ঠস্বরটা বাটনের উৎসাহ উস্কে দিল আরেকটু।

'কি রকম? দাঁড়াও–,' কথা বলার লোক পেয়ে ছড়ে শেষ টান দিয়ে বাটন কাঁধ থেকে নামাল বেহালাটা। কপালের ঘাম মুছল আস্তিন দিয়ে। তামাক ভরে নিল ছাইমাখা একটা পাইপে। এতক্ষণ একমনে বাঁ কানের নিচে ঠেকিয়ে বেহালায় সুর তুলছিল। নাবিকদের ঘুমোবার ঘরে বসে আছে সে একটা কাঠের বাক্সে। পরনে ঢোলা প্যান্ট, ডোরাকাটা জামার উপর জ্যাকেট। রোদে ও লবণাক্ত হাওয়ায় বিবর্ণ সবুজ হয়ে গেছে ওগুলোর রঙ। কুয়াশার ভেতর দিয়ে চাঁদকে যেমন দেখায় তেমনি তার মুখশ্রী। জাহাজের সবাই ওকে 'ন্যাটা প্যাট' বলে ডাকে। বাঁ-হাতি নয়, শুধু কাজের

ভুলের জন্য ওর এ উপাধি। পাল খাটানো বা গুটানো, ঠাণ্ডা জলের পাত্র পরিষ্কারে যদি কখনও গোলমাল হয়, বুঝতে হবে, প্যাট-এর কাজ। জাতিতে কেল্ট। চল্লিশ বছর ধরে সে সাগরে সাগরে। লবণাক্ত জল তার ও হালের মধ্য দিয়ে বয়ে গেলেও তার রক্তের কেল্টিক উপাদান ধুয়ে যায়নি। পরীদের সম্পর্কে তার অটুট বিশ্বাস আর কৌতূহল। পৃথিবীর সব বন্দরের মদ তার পেটে পড়েছে। মার্কিনী মাল্লাদের হাতে মারধর খেয়েছে প্রচুর। তাতে কি? থোড়-বড়ি-খাড়া, খাড়া-বড়ি-থোড়। মাল্লাদের শোবার ঘরে পালের দড়ি বাঁধা খুঁটির গায়ে ঝুলছে তেলের বাতি, দুলে দুলে অন্ধকার দূর করছে। ইতস্তত ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে বাঙ্ক। কারও পা ঝুলতে দেখা যাচ্ছে। পাইপ টানছে কেউ! আজকাল দ্বিমাস্তুল জাহাজে মাল্লা লাগে অনেক। 'নর্দামবারল্যান্ড' জাহাজের মাল্লারা খেতমজুরের কিংবা শুয়োর পালার কাজ করত আগে। কিন্তু পৃথিবীর যত মন্দ এবং ভাল-র মিশ্রণে তৈরি প্যাডি বাটনের মত পোড় খাওয়া নাবিক আর একজনও নেই। 'নর্দামবারল্যান্ড' বহু সমুদ্রে ঘুরেছে। তিনটে ঢেউ এক মাইলের চেয়েও বেশি লম্বায় চওড়ায়, এমন সাগরেও। নিউ অর্লিয়েন্স থেকে সানফ্রানসিসকো পর্যন্ত তিরিশ দিন ক্রমাগত সম্মুখ-বাতাস আর ঝড়ের মুখোমুখি হয়েছে। স্টিফ অন্তরীপ ঘুরতেও লাগিয়েছে তিরিশ দিন। এই মুহূর্তে জাহাজটি দক্ষিণের এক ভীষণ শান্ত জলে বন্দী।

'লেপ্রিকুন—লেপ্রিকুনের মত ছাড়া আর কি রকম দেখতে হবে?'

'সেইটাই তো জানতে চাই,' আবার একটু খুঁচিয়ে দিল ডাচ।

'হুম্—,' পাইপে জোরে একটা টান দিয়ে গভীর ভাবনায় ডুবে গেল বুড়ো। কল্পনার দৃষ্টি কনট গাঁয়ে। 'ছোট এইটুকুন মনিষ্যি,' বাম হাতের তালু নিচে, উপর মুখী, ডান হাতেরটা ওপরে, নিচ মুখী করে দেখল পরীর সাইজটা, 'মুলোর মত গায়ের রঙ। ওহ্,

সেই কবে গেছিলাম কনট গাঁয়ে। মশা! বাপ্‌রে বাপ্‌! হাড় পর্যন্ত ঢুকে গেল হুল। উফ্‌! কামড় খেয়েও বোবার মত চেয়ে রইলাম সবুজ পরীটার দিকে।'

'চাপা,' মনে মনে বলল ডাচ। 'তবুও চালিয়ে যাও বাপু, শুনি তোমার গপ্পো।'

'কথা বিশ্বাস করিস আর না করিস, তুই ওটাকে পকেটে রাখতে পারিস,' যেন দিব্য চোখে দেখতে পাচ্ছে প্যাডি। 'আমার খালা রেখেছিল আলমারিতে। সেখান থেকে ঝাঁপ দিয়ে কখনও দুধের বাটিতে, কখনও বিছানার তলায় চলে যেত।'

'উদ্ভট,' ভাবল ডাচ।

'কখনও শুয়োর তাড়া করত। থাকত গর্তে। মুরগীর ডিমের থেকে ছ'মাথা আর সাতাশ পাঅলা বাচ্চা বের করত। ধরতে যাও–ধড়িবাজ, হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে। শেষে–' দম নিল বাটন, 'শুয়োর যখন গর্ত থেকে নাকি বের করল, অমনি ছুটে আলমারিতে।'

'এসেছিল কোত্থেকে ওটা?' নিখাদ বিস্ময় প্রকাশ করল ডাচ।

'বলছি, বলছি,' হাত তুলে থামতে ইশারা করল বাটন, 'কত শয়তানি করত। বাঁধাকপি রান্না হচ্ছে, ঝোল মাখিয়ে দেবে তোর মুখে। এখন কি করবি তুই, বল? রাগ করবি? পারবি না। চোখ কটমট করে উঠলেই ছুটে গর্তে ঢুকবে। নরম হাত দুটো পেছনে, বেরিয়ে এসে তোর হাতে তুলে দেবে একটা সো-না-র মোহর।'

'সোনার!'

'হ্যাঁ,' নির্বিকারভাবে বলল বাটন।

'আহা! ওটা যদি থাকত একটা,' কে যেন বলল অন্য একটা বাংক থেকে। ওর গল্প এখন অনেকেই শুনছে। পেট ভরে গেল বাটনের খুশিতে। যাক সবাই শুনছে তাহলে!

'আচ্ছা, প্যাট,' আরেকজন শুধাল ওকে, 'ধর্‌, সোনার

মোহরটা এখন পেলি তুই–ধরে নে, পেয়েই গেছিস্, কি করবি?'

'দরিয়ার মধ্যে তো তেমন কিছু নেই। জলো মদ ছাড়া। ডাঙায় হলে–' একটু থামল, হয়তো দৃশ্যটা কল্পনায় দেখল, 'বলতে শরম নেই, মদ পেটে পড়লে শয়তান বনে যাই। জীবনের শেষ দিনতক এটা থাকবে। দরিয়া থেকে ফিরলাম বাড়ি, মা বলল, প্যাট, তুই তুফান থেকে বাঁচবি, মেয়েছেলের হাত থেকে রেহাই পাবি, কিন্তু এই বিষ তোকে খাবে, দেখিস।'

'এখনও খায়নি, তোকে?' ওহিও দেশের একজন ছুঁড়ে দিল কথাটা।

'না, একদিন খাবে।'

আজকের রাত বড় সুন্দর।

চারদিকে নিস্তব্ধতা। ডেকের ওপর দাঁড়ালে দেখা যায় আকাশের ঝিকিমিকি তারা। উজ্জ্বল, নীরব একটা রাত। প্রশান্ত মহাসাগর যেন ঘুমিয়ে আছে। ক্ষীণ একটা ক্যাঁচকোঁচ শব্দ। তরঙ্গের মৃদু দোলা লেগে হাল থেকে ভেসে আসছে। দক্ষিণী ক্রস কাটা ঘুড়ির মত ঝুলছে আকাশে। মাথার ওপরে ছায়াপথের তোরণ। ভয় ধরিয়ে দেয় মনে। নিস্তরঙ্গ সাগর জুড়ে কোটি কোটি তারার ছায়া। রাতের শহর যেন। উজ্জ্বল, জীবন্ত। কিন্তু নিঃশব্দ।

কেবিনে তিনজন যাত্রী। বইয়ে চোখ রেখে বসে আছেন আর্থার লেস্ট্রেঞ্জ। দীর্ঘ, ক্লান্তিকর সমুদ্র যাত্রাকে ভুলে থাকার জন্যই তাঁর এই প্রয়াস। এক কোণে আট বছরের এমেলিন লেস্ট্রেঞ্জ, আর্থারের ভাইঝি। হাতে কি একটা নিয়ে দোলা দিচ্ছে আর নিজের মনে কথা বলছে। ডাগর চোখ, চোখা নাক, ছোট্ট থুতনি। একরাশ সজীব সৌন্দর্যের প্রতীক যেন। লেস্ট্রেঞ্জের ছেলে ডিক, এমেলিনের চেয়ে একটু বড়। এখন সে টেবিলের নিচে লুকিয়ে আছে। এদের দেশ বোস্টনে। যাবে সানফ্রান্সিসকো। ছোট একটা জমিদারি

কিনেছেন লেস্ট্রেঞ্জ। ইচ্ছে, শেষ জীবনটা ওখানেই কাটাবেন।

'ছেলেদের ঘুমোবার সময় হয়েছে,' কেবিনের দোর খোলা। একটি মুখ উঁকি দিচ্ছে। মিসেস স্ট্যানার্ড, গভর্নেস।

'ডিকি,' বই বন্ধ করে, টেবিলের ঢাকনা তুলে ডাকলেন লেস্ট্রেঞ্জ।

'না বাপি, এখন না,' ঘুমজড়ানো আদুরে গলায় বলল ডিক। টেবিলের কাছে এসে দাঁড়াল মিসেস স্ট্যানার্ড। হিড় হিড় করে টেনে বের করে আনল ডিকের পা ধরে। লাথি ছুঁড়ে, যুদ্ধ করে, অবশেষে কান্না জুড়ে ফায়দা হলো না কিছু। দরজা পর্যন্ত পৌঁছে কান্না ভেজা মুখ তুলে বাবাকে জানাল, 'শুভরাত্রি।'

পুরো ঘটনাটা লক্ষ করে চট করে দাঁড়িয়ে পড়ল এমেলিন। এতক্ষণ ন্যাকড়ার একটা পুতুলকে আদর করছিল সে। তাড়াহুড়োয় পুতুলটার ঠ্যাং ধরে মাথাটা শূন্যে ঝুলিয়ে ছুটে গেল ঘরের বাইরে। লেস্ট্রেঞ্জ হাসি চেপে মনোনিবেশ করলেন বইয়ে। একটু পরেই দরজার পাল্লা খুলে গেল। এমেলিন। পরনে রাত্রিবাস।

'আমার বাক্স,' বলে ছোট একটা বাক্স তুলে নিল ঝট করে, যেন কেড়ে নেবে কেউ। চলে গেল। 'কাক্কু!' দরজার বাইরে গিয়ে মুখটা বাড়িয়ে দিয়েছে। হাসছে। স্বর্গ নেমে এসেছে যেন। 'গুড নাইট।' অদৃশ্য হয়ে গেল পূর্ণিমার চাঁদের মত মুখ। বাক্সের জন্য এসেছিল। জিনিসটা ওর খুব প্রিয়। আজ পর্যন্ত যত ঝামেলা হয়েছে তা ওই বাক্সটার জন্য। জাহাজের সমস্ত মাল খোয়া গেলেও বোধহয় এত ঝঞ্ঝাট হত না। বোস্টনে ওর এক বান্ধবী জাহাজে উঠবার সময় এই উপহারটি দেয়। ভেতরের বস্তুটির কথা আজও অজানা জাহাজ যাত্রীদের কাছে। জানে শুধু কাক্কু লেস্ট্রেঞ্জ। মুশকিলের ব্যাপার বারবার হারায় বাক্সটা। পৃথিবীটা খালি ডাকাতে ভরা। তারাই ওর বাক্সটা চুরি করে। এই ধারণা

AMARBOI.COM

এমেলিনের। মাল্লাদের কাজকর্ম দেখতে দেখতে এক সময় আবিষ্কার করে সে, বাক্সটা নেই। চেহারা করুণ। ব্যস্ত-সমস্ত পা ফেলে চুপচাপ খুঁজে বেড়ায় সে জাহাজের প্রতিটি কোণ। ভূতের মত। রান্নাঘর থেকে নিয়ে ঘুমোবার ডেক পর্যন্ত। ত্রস্ত-ব্যস্ত হয়ে ওঠে জাহাজের সব যাত্রী। খোঁজ খোঁজ রব পড়ে যায় জাহাজে। খুঁজে দেয় বুড়ো প্যাডি বাটন, এমেলিনের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু। মস্ত বড় একটা শ্বাস ফেললেন লেস্ট্রেঞ্জ। বই বন্ধ করে উঠে দাঁড়ালেন। সুসজ্জিত কেবিনের একটা আয়নায় প্রতিচ্ছবি পড়ল তাঁর। চমকে উঠলেন। ভয়ানক কৃশ দেখাচ্ছে তাঁকে। হঠাৎ মনে হলো, মারা যাবেন তিনি। খুব শিগ্‌গির। আয়না থেকে চোখ সরিয়ে খানিকক্ষণ বসে থাকলেন লেস্ট্রেঞ্জ। কেবিনের অপর প্রান্তের সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলেন ডেকে। হাঁপাচ্ছেন। রাতের সমারোহ আর সৌন্দর্য তাঁর যন্ত্রণা আরও বাড়িয়ে দিল। ডেক চেয়ারে বসে তাকিয়ে আছেন ছায়াপথের দিকে। আবর্তময় এক পাতাল বলে মনে হলো তাঁর ছায়াপথটাকে। চাঁদ উঠল। নিষ্প্রভ হয়ে গেল তারাগুলো। হঠাৎ মাথাটা ঝিম ঝিম করে উঠল তাঁর।

'হাওয়া যে কোথায় উধাও হয়ে গেল! মনে হয় আকাশ ফুটো করে পালিয়েছে।' উঠতে যাচ্ছিলেন, বসে পড়লেন লেস্ট্রেঞ্জ, লা ফার্জ, ক্যাপ্টেন। চিনতে পেরেছেন কণ্ঠস্বরটা। কখন জানি নিঃশব্দ পায়ে একেবারে কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন।

'বড় লম্বা সফর হয়ে গেল, ক্যাপ্টেন,' ধীর কণ্ঠে বললেন লেস্ট্রেঞ্জ, 'আমরা কি সানফ্রান্সিসকো পৌঁছুতে পারব?'

'আপনি শুধু শুধু ভাবছেন। আমরা এখন এক উষ্ণ তরল মরুভূমির মধ্য দিয়ে চলেছি। গোল্ডেন গেট-এর কাছাকাছি এলেই আপনিও চাঙ্গা হয়ে উঠবেন আমাদের মত।'

'আমি বাচ্চা দুটোর কথা ভাবছি,' যেন ক্যাপ্টেনের কথা শুনতে পাননি এমনিভাবে বলে চলেছেন লেস্ট্রেঞ্জ। 'বন্দরে

পৌঁছুবার আগেই যদি আমার কিছু হয় তবে কয়েকটা অনুরোধ রইল। বাচ্চারা যেন জানতে না পারে,' প্রায় ফিসফিসিয়ে বললেন, 'চুপচাপ আমার সৎকার করবেন। ক্যাপ্টেন, মৃত্যু কি ওরা জানে না, আসলে জানতে দিইনি আমি।'

লা ফার্জ অস্বস্তি নিয়ে নড়েচড়ে বসলেন চেয়ারে।

'এমেলিনের বাবা, আমার ভাই, মারা গেছে ওর জন্মের আগেই। 'মেয়েটা দু'বছরের যখন, মারা গেল ওর মা। আর ডিকি–,' ভারী হয়ে এল লেস্ট্রেঞ্জের কণ্ঠস্বর। 'ডিকি মায়ের মুখই দেখেনি। প্রসবের সময় মারা গেছে ওর মা। মৃত্যুর ভয়াল থাবা আমাদের পরিবারকে কাহিল করে দিয়েছে। সেজন্যই মৃত্যুকে গোপন রেখেছি ওদের কাছে।'

চোয়াল ঝুলে পড়েছে লা ফার্জের।

'যমদূতের জরিমানা যদি মাটি স্পর্শ করার আগেই দিতে হয়, তবে, এই সাগরে সমাধি দেবেন আমার। বাচ্চাদের বলবেন আরেকটা জাহাজে চলে গেছি আমি। বোস্টনে নিয়ে যাবেন ওদের। একটা চিঠিতে সব লেখা থাকবে। এক মহিলা ভার নেবে ওদের। ভালই থাকবে ওরা। করবেন তো, ক্যাপ্টেন?'

'মিছে ভাবনায় পেয়ে বসেছে আপনাকে,' ক্যাপ্টেনের কণ্ঠে তিরস্কার।

AMARBOI.COM

চাঁদ দিগন্ত ছাড়িয়ে উপরে উঠে গেছে। নর্দামবারল্যান্ড যেন তরল রুপোর ওপর ভাসছে। মাস্তুলগুলো স্পষ্ট দেখা যায়। পালের প্রতিটি কোনা আর ডেক কুয়াশার মত আলো আঁধারিতে ছেয়ে গেছে। সেদিকে চেয়ে থাকতে থাকতে চমকে উঠলেন লেস্ট্রেঞ্জ। সেলুনের ঢাকনা খুলে ছোট্ট একটা সাদা মূর্তি বেরিয়ে এল। এমেলিন! ঘুমের মধ্যে হাঁটা ওর রোগ। ঘুমের রাজ্যে সে বহুমূল্য বাক্সটা হারিয়ে ফেলেছে। ডেকে এসে খুঁজছে এখন। নিঃশব্দে

অনুসরণ করলেন লেস্ট্রেঞ্জ ওকে। দড়ির স্তূপের আড়ালে খুঁজল খানিকক্ষণ। কাঁধ ঝাঁকাল। হতাশ হয়েছে। রান্নাঘরের দরজা খুলবার চেষ্টা করছে। বড় বড় চোখ মেলে বিব্রত মুখে এখানে সেখানে খুঁজছে সে বাক্সটা। মুরগীর খোঁয়াড় থেকে কাল্পনিক বাক্সটা উদ্ধার করল অবশেষে। একহাতে নাইট ড্রেসের কোনা তুলে সেলুনের সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল সে খুশিমনে। একটা হাত বাক্স ধরার কায়দায় ভাঁজ হয়ে আছে।

পুরোটা সময় দুহাতে এমেলিনকে আগলে রাখলেন লেস্ট্রেঞ্জ।

আজ চতুর্থ দিন।

নিস্তরঙ্গ সাগর। নিথর হয়ে আছে চারদিক।

'বাপি,' রেলিঙ-এর ওপর ঝুঁকে থেকেই চেঁচিয়ে উঠল ডিক।

'কি হলো?'

'মাছ!'

রেলিং-এ ঝুঁকে দেখলেন লেস্ট্রেঞ্জ। গাঢ় সবুজ জলে অস্পষ্ট অথচ ভয়ঙ্কর কিছু একটা নড়ছে। ডুব দিল। ভেসে উঠল আরেকটা পাশেই। ঝলকনে ঠাণ্ডা ভয়ের একটা স্রোত নেমে গেল লেস্ট্রেঞ্জের শিরদাঁড়া বেয়ে। ডিককে দু'হাতে আঁকড়ে ধরলেন।

'কী সুন্দর--না বাপি?' খুশি হয়ে উঠছে ডিক। 'একটা ছিপ থাকলে জাহাজে তুলে আনতাম ওটাকে। একি! বাপি, তুমি আমাকে পিষে ফেলছ যে!'

এমেলিন এসে দাঁড়িয়েছে রেলিঙে।

'কাক্কু, ওটা কি?'

'হাঙর, চলে এসো।'

প্রায় জোর করেই টেনে আনলেন ওদেরকে। কেবিনে বসতে গিয়ে টের পেলেন কাঁপছেন তিনি। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

AMARBOI.COM

*

অসহ্য গরম। বিকেল তিনটে। ঘণ্টা বাজল।

গভর্নেস এসে দাঁড়াল বাচ্চাদের নিয়ে যাবার জন্য। ডেকে উঠে এলেন লেস্ট্রেঞ্জ। সমুদ্রের ওপর ঘন কুয়াশা জেগে উঠছে। সূর্যের তেজ কম।

'প্রশান্ত মহাসাগরে কুয়াশা দেখেছেন কখনও?'

পেছন ফিরে তাকালেন লেস্ট্রেঞ্জ। ক্যাপ্টেন লা ফার্জ। উত্তর না দিয়ে নীরবে মুখ ঘুরালেন। দিগন্ত অস্পষ্ট হয়ে আসছে ক্রমশ। হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসছে একটা ছায়া।

'দেখেননি? দেখতে যেন না হয়।' সাড়া না পেয়ে নিজের মনে বিড় বিড় করলেন ক্যাপ্টেন। হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠলেন তিনি।

'কিসের গন্ধ!' নাক টানলেন। 'কোথায় যেন কি পুড়ছে? গন্ধ পাচ্ছেন? রাঁধুনির ন্যাতা নাকি? জেনকিনসের কাণ্ড বোধহয়? বুদ্ধুটা–' সেলুনের ওপর পাটাতনের কাছে ঢাকনার মুখ নামিয়ে হাঁক দিলেন, 'নিচে কে?'

'আমি, স্যার,' চেঁচিয়ে বলল জেনকিনস্।

'কি পোড়াচ্ছ?'

'আমি কিছু পোড়াইনি, স্যার।'

'গন্ধ আসছে যে!'

'এখানে নয়।'

'ক্যাপ্টেন!' চমকে পেছন ফিরলেন লা ফার্জ। লেস্ট্রেঞ্জ চুপ করে সমুদ্র দেখছিলেন এতক্ষণ। এখন দৃষ্টি মাস্তুলের দিকে। 'ওখানে,' তর্জনী তুলে ইশারা করলেন। 'প্রধান মাস্তুলে–আমার চোখে দোষ না হলে–কিছু আজব জিনিস দেখছি।'

ওরা হেঁটে এগিয়ে এল। চাঁদোয়ার নিচে থমকে দাঁড়াল। প্রধান মাস্তুলের খুঁটি যেখানে ডেকের ভেতর ঢুকেছে, সেখানে কুণ্ডলী আকারে কিছু ঘুরছে। কুয়াশার মত অস্পষ্ট কিছু। চক্র

কাটছে।

'মাই গড!' চিৎকার করে উঠলেন লা ফার্জ। লাফ দিয়ে নামলেন পাটাতনে। হাঁপাতে হাঁপাতে রেলিঙ ধরে ছুটলেন। তীক্ষ্ণ একটা শব্দ শুনে ধড়াস করে লাফিয়ে উঠল তাঁর কলজেটা। বাঁশি বাজাচ্ছে মাল্লা। ঘুমোবার জায়গাটা থেকে মৌমাছির ঝাঁকের মত কর্মী হাতগুলি উঠে আসছে। ভিড় করল ওরা ঢাকনার কাছে। ত্রিপল আর নৌকোর বন্ধনী খুলে ফেলল দ্রুত হাতে। খুলে দিল ঢাকনা। কালো, বীভৎস কালো ঘন ধোঁয়া বাতাসহীন আকাশে প্রবল বেগে ছুটে যাচ্ছে।

লেস্ট্রেঞ্জের শিরদাঁড়া বেয়ে ঠাণ্ডা সাপ হেঁটে গেল। ভীতু প্রকৃতির লোক তিনি, কিন্তু মাথা ঠিক রাখলেন। বাচ্চা দুটির কথা ভাবলেন। নর্দামবারল্যান্ডের নৌকোগুলো নষ্ট হয়েছে কেপহর্ন পাড়ি দেবার সময়। এখন দুটো নৌকো আর ডিঙ্গি আছে একটা। সবেধন নীলমনি। তীব্র গতিতে ছড়িয়ে পড়ছে ধোঁয়া। দু'চোখে আঁধার দেখছেন লেস্ট্রেঞ্জ। ছুটলেন কেবিনে। ছুটতে ছুটতে শুনতে পেলেন ঢাকনা বন্ধ করে পাম্প চালাবার নির্দেশ দিচ্ছেন ক্যাপ্টেন। কেবিনের দিকে ছুটতে থাকা অবস্থায় মিসেস স্ট্যানার্ডকে দেখতে পেলেন। থমকে গেলেন। উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছেন তিনি।

'বাচ্চারা কি ঘুমুচ্ছে?' দম বন্ধ হয়ে এল কথাটা জিজ্ঞেস করতে। বিস্ফারিত চোখে চেয়ে আছে মহিলা। দিশেহারার মত নিচে নেমে গেল আবার।

'ওদের জাগিয়ে জামা-কাপড় পরিয়ে দিন,' কেবিনের ওপর একটু ঝুঁকে লেস্ট্রেঞ্জ চেঁচিয়ে বললেন। নিচে বাচ্চাদের জোড়া পায়ের শব্দ শুনে খানিকটা নিশ্চিত হয়ে মাস্তুলের দিকে তাকালেন। ধোঁয়ায় আকাশ ছেয়ে গেছে।

'মাই গড,' আর্তনাদ করে উঠলেন তিনি।

*

সিঁড়িতে প্রচণ্ড শব্দ তুলে লা ফার্জ ঢুকলেন সেলুনে। তাঁর মুখ রক্তের মত লাল। দৃষ্টি মাতালের মত। কপালের দু'পাশের রগ ফুলে ফুলে উঠছে।

'বাচ্চাদের তৈরি করে নাও। নৌকা-নৌকা নামাও। এই লোকেরা, আমার কাগজপত্র কোথায়?' চিৎকারের শব্দ মাল্লাদের আতঙ্কিত চেঁচামেচির সাথে মিশে গেল। পাগলের মত নিজের কেবিনে ঢুকলেন। দক্ষ ও যোগ্য নাবিক তিনি। বিপদের সময় মাথা ঠিক রেখেছেন। খুঁজে খুঁজে দরকারী জিনিসের একটা পোঁটলা নিয়ে চিৎকার করে বাচ্চাদের ডেকে আনবার আদেশ দিলেন। চেঁচাতে চেঁচাতেই উঠে এলেন ডেকে হুড়মুড় করে।

ডেকের উপর প্রধান মেটের নির্দেশে মাল্লারা ছুটোছুটি করছে। নৌকোগুলোর উপর পলিথিনের ঢাকনা খুলে ফেলা হয়েছে। তাতে তোলা হচ্ছে জলের পিপে আর বিস্কুটের বস্তা। ছোট ডিঙিটায় জল-খাবার রাখছিল প্যাডি বাটন। হাঁই-ফাই করতে করতে ছুটে এলেন লা ফার্জ। তাঁর সঙ্গে মিসেস স্ট্যানার্ড, কোলে এমেলিন। প্রায় সাথেই দেখা গেল লেস্ট্রেঞ্জকে, সঙ্গে ডিক। ডিঙ্গিটা একটু বড়। দু'জন নাবিক এটাকে জলে ভাসাবার জন্য তৈরি।

কাজ শেষ করে সটকে পড়ার আগেই ক্যাপ্টেন খপ্ করে ধরে ফেললেন প্যাডি বাটনের হাত। 'ডিঙিতে উঠে পড়ো,' ক্যাপ্টেনের গলায় ব্যস্ততা, 'বাচ্চাদের নিয়ে যতদূর পারো চলে যাও।'

'কিন্তু, ক্যাপ্টেন,' ইতস্তত করছে প্যাট, 'আমার বেহালাটা–'

'যাও,' প্রায় ধাক্কিয়ে ডিঙিতে ঠেলে দিলেন বাটনকে। নৌকোয় উঠে পড়তেই এমেলিনকে তুলে দেয়া হলো। এমেলিনের মুখ বিবর্ণ, চোখ দুটো বড় বড়। ছোট্ট একটা শালে কিছু জড়িয়ে ধরেছে সে শক্তভাবে। লেস্ট্রেঞ্জ আর ডিকও উঠে এল।

'আর জায়গা নেই!' লা ফার্জ চিৎকার করে শুধোলেন, 'মাই

গড, মিসেস স্ট্যানার্ড–ঠিক আছে আপনি পরের নৌকোয় উঠুন। নৌকো নামাও,' হুঙ্কার ছাড়লেন ক্যাপ্টেন।

নীল সমুদ্রে ভাসছে ছোট্ট একটা ডিঙি। জাহাজ থেকে ক্রমেই দূরে সরে আসছে ওরা। 'আরে!' হঠাৎ বিদ্যুৎচমকের মত কথাটা মনে এল বাটনের। 'বাঁচতে চাও তো পালাও!' গলা ছেড়ে চিৎকার করছে বাটন জাহাজের যাত্রীদের উদ্দেশে। 'জাহাজের খোলে দু'ব্যারেল বারুদ রয়েছে,' খোলা সমুদ্রের উপর দিয়ে সে চিৎকার মিলিয়ে গেল কুয়াশা আর ধোঁয়া ঢাকা আকাশে।

কথাটা জানিয়েই ঝট করে ঝুঁকে পড়ল সে। ক্ষিপ্র হাতে তুলে নিল বৈঠা। ডিক আর এমেলিনকে জড়িয়ে ধরে নৌকোর গলুইয়ে বসে আছেন লেস্ট্রেঞ্জ। বাটনের কথা শুনে বোঁ করে ঘুরে উঠল মাথা। দু'চোখে আঁধার দেখছেন তিনি। ডিক আছে ফুর্তিতে। জলের ভেতর আঙুল ডুবিয়ে ঢেউ তুলছে সে। চাচার হাত ধরে এমেলিন চেয়ে আছে বাটনের দিকে।

বৈঠা দিয়ে দ্রুত জল কাটছে বাটন। উত্তেজনায় টান টান হয়ে আছে ওর পেশীগুলো। বার বার পেছন ফিরে চাইছে সে। চোখে আতঙ্ক। হাঁপাচ্ছে। মুখটা ভেংচি কেটে আছে যেন। বড় আর মাঝারি নৌকো দুটো জলে ভাসছে। হুড়মুড় করে নেমে আসছে তাতে মাল্লারা। কালো ধোঁয়া। সাথে আলোর ঝলক। আগুনের স্ফুলিঙ্গে আলোকিত হয়ে উঠছে চারপাশ। ড্রাগনের আধখোলা মুখ থেকে যেন বেরিয়ে আসছে, সেদিকে চেয়ে ভাবল প্যাডি। মাইল খানেক দূরে ঘন কুয়াশা। সাদা সাদা অলৌকিক পাহাড়ের সারি যেন।

'দম ফুরিয়ে গেছে আমার,' শ্বাসকষ্টে আর্তনাদ করে উঠল বাটন। হাঁটুর তলায় ঠেলে দিল বৈঠা। এমন ভাবে ঝুঁকে পড়েছে সে মনে হচ্ছে যেন অন্য যাত্রীদের মাঝে উল্টে যাবে। 'জাহাজ উড়ে যাক আর না যাক, আমি আর পারছি না।'

পাথরের মূর্তির মত বসেছিলেন লেস্ট্রেঞ্জ। হুঁশ ফিরল বাটনের কথায়। তাড়াতাড়ি বৈঠা তুলে নিলেন হাতে। এতক্ষণে অন্য নৌকাগুলো নজরে এল। ভূতে তাড়া করেছে যেন ওদের। ডিক আঙুল ডুবিয়ে পানি ছিটাচ্ছে তখনও। এমেলিনের চোখ প্যাডি বাটনের দিকে। 'এই নাও,' জামার পকেট হাতড়ে ছোট একটা কমলালেবু বাটনের মাথায় ছোঁয়াল এমেলিন। মাথা তুলল বাটন। শূন্য দৃষ্টিতে সামনের বাড়ানো কমলালেবুটা দেখল কয়েক মুহূর্ত। নিজের বাচ্চাদের কথা মনে পড়ল তার। নিজেকে ফিরে পেল যেন, লেস্ট্রেঞ্জের হাত থেকে ছোঁ মেরে বৈঠা কেড়ে নিল সে।

'বাপি,' জাহাজের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল ডিক। ঠিক তখনি কড়াৎ শব্দে কানে তালা লেগে গেল সবার। মুখের কথা মুখেই রয়ে গেল। কুয়াশার জমাট বাঁধা স্তূপ সচল হলো হঠাৎ। আগুনের হলকা আকাশ ছোঁবে যেন। পালগুলো কাঁপছে। জাহাজ থেকে দমকে বেরিয়ে আসা ধোঁয়া তাড়া করছে নৌকাগুলোকে।

'কাক্কু,' আর্তস্বরে ডাকল এমেলিন, 'কত্তো মূর্তি!' ভয়ে আঁকড়ে ধরেছে সে লেস্ট্রেঞ্জকে। ওকে বুকে জড়িয়ে সান্ত্বনা দিলেন লেস্ট্রেঞ্জ, 'ওগুলো কুয়াশা।' কেঁপে গেল তাঁর স্বর। ভয়ের হিমশীতল একটা স্রোত বয়ে গেল শিরদাঁড়া বেয়ে। আগুনের স্রোত ছুটে আসছে এদিকে। ছুঁই ছুঁই করে ছুঁতে পারল না পেছনের নৌকাগুলোকে।

খানিকক্ষণ পর। নিরাপদ দূরত্ব থেকে ওরা দেখল, একটা ন্যাকড়ার মত জ্বলছে কাঠের জাহাজটা।

সূর্যের আলো স্তিমিত হতে হতে মুছে গেল একসময়। সোনালি আলোর ছটায় সমুদ্রের বুকে অপূর্ব রঙের খেলা চলছিল এতক্ষণ। ডিঙি নৌকোটার চারপাশের কুয়াশা তত গাঢ় নয়। কিন্তু অন্য দুটোকে আবছা দেখাচ্ছে। দিগন্তের শেষ রেখা অদৃশ্য হয়ে গেল।

বড় নৌকোটা অনেক দূর এগিয়ে গেছে। ক্রমশ কাছিয়ে এল নৌকো দুটো।

'ডিঙির লোকেরা–' ক্যাপ্টেন লা ফার্জের জোরাল গলা শোনা গেল।

'এই যে,' বাটন চেঁচিয়ে জবাব দিল।

'কাছে এসো।'

দাঁড় টানা বন্ধ করে বড় নৌকো অপেক্ষা করছে ডিঙির জন্য। ডিঙিটা মজবুত কিন্তু এই মুহূর্তে বহনক্ষমতা থেকেও বেশি যাত্রীতে ঠাসা।

'মি. লেস্ট্রেঞ্জ,' ডিঙি ভিড়তেই লা ফার্জের অস্থির গলা শোনা গেল, 'আমার নৌকোয় উঠে আসুন,' ততক্ষণে বড় নৌকোটার পাশে মাঝারিটা থামল, এই নৌকোটাও অতিরিক্ত যাত্রীতে ভরা। চাপাচাপিতে ডুবে যাবার সম্ভাবনা দেখে ক্যাপ্টেন বললেন, 'মিসেস স্ট্যানার্ড, বাচ্চাদের কাছে চলে যান আপনি। নৌকোটাও হালকা হোক।'

বিহ্বল লেস্ট্রেঞ্জ চলে গেলেন বড় নৌকোয়। মাঝারিটা থেকে মিসেস স্ট্যানার্ড ডিঙিতে ওঠার চেষ্টা করছে।

'তাড়াতাড়ি, ওহ্, বি কুইক!' ক্যাপ্টেন অসহিষ্ণু গলায় চিৎকার করলেন। হঠাৎ একটা ঘন হাওয়ার ধাক্কা খেল বাটন। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল ওর। সামলিয়ে চোখ তুলল সে। একি! ওরা কোথায়? ঘন কুয়াশার পাঁচিল দাঁড়িয়ে আছে ওর সামনে। বড় নৌকো দুটো হাওয়া হয়ে গেছে এক নিমেষে।

বোবার মত চেয়ে রইল সে দেয়ালটার দিকে। মিসেস স্ট্যানার্ড নামতে পারেননি। কিংকর্তব্যবিমূঢ় বাটন কি করবে সিদ্ধান্ত নিতে নিতেই কেটে গেল খানিকক্ষণ। কুয়াশার দেয়াল। ওপাশে অস্পষ্ট কথাবার্তার আওয়াজ। জোরে দাঁড় টেনে ওদের কাছে পৌছুনোর চেষ্টা করল এবার বাটন। দূরাগত চিৎকার ভেসে আসছে, দেখতে

AMARBOI.COM

পাচ্ছে না কেউ কাউকে। বাটন দ্রুত বৈঠা চালাচ্ছে বড় নৌকোটাকে ধরবার জন্য আন্দাজের ওপর। চিৎকারের শব্দও শোনা যাচ্ছে না আর। মহাসমুদ্রে আর কুয়াশায় একটা অস্পষ্ট বুদ্বুদের মত জেগে আছে ডিঙিটা।

'প্যাডি, আমরা কোথায়?' অস্ফুট স্বরটা ডিকের।

'ঘাবড়িয়ো না,' তাড়াতাড়ি বলল বাটন। দৃষ্টি তার ঘোর কুয়াশার দিকে। যেন ওটাকে ভেদ করে বড় নৌকোটাকে দেখতে পাবে ও।

'এম ভয় পেয়েছে, কাঁপছে,' আবার ক্ষীণ স্বরে বলল ডিক।

বিমূঢ় অপ্রস্তুত হয়ে তাকাল বাটন ওদের দিকে। বৈঠা থামিয়ে কোট খুলে ফেলল। 'এটা দিয়ে ওকে ভাল করে জড়িয়ে দাও,' ছুঁড়ে দিল কোটটা ডিকের দিকে।

'কে আছ?' এবার অস্বাভাবিক স্বরে চেঁচাল বাটন।

'কে আছ–' মুখ তুলে ভয়ার্ত স্বরে ডেকে উঠল ডিক।

'কে আছ–' ডাকতে গিয়ে এমেলিনের কচি স্বর ভেঙে গেল। একটা উত্তর ভেসে এল। খুব অস্পষ্ট। কোন্ দিক দিয়ে এল বোঝা গেল না। প্রাণপণে বৈঠা চালাল বাটন আন্দাজের ওপর। বৈঠার টানের সঙ্গে জলের শব্দ শুধু জেগে রইল। হাঁপিয়ে উঠেছে বাটন উত্তেজনায় আর পরিশ্রমের ক্লান্তিতে। একটা নিস্তব্ধতা ঘিরে ফেলল ওদের। আকাশের আলো ঘন কুয়াশার ওপারে ঘষা কাচের ভেতর দিয়ে আসছে যেন। তার রঙ পাল্টে যাচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে। সমুদ্রের এই পরিবেশ বাটনের পরিচিত। ও জানে, কুয়াশা এইভাবে জমাট বেঁধে থাকবে না। ঘনত্ব বদলাবে। কখনও এর রূপ মৌচাকের মত, অসংখ্য রাস্তা থাকে তাতে। পরিষ্কার বাতাসের গর্ত থাকে গুহার মত। রূপ পাল্টাতে থাকে বারে বারে যাদুকরের হাতের স্পর্শে। মায়ালোকের মত। কিন্তু এখন বাড়ছে কুয়াশা। বাড়ছে আঁধার। তার মানে রাত এখন।

'ষাঁড়ের মত চেঁচালাম, কানে গেল না কালাদের,' বৈঠা চালাতে চালাতে ঝাঁঝিয়ে উঠল বাটন।

'মি. বাটন!' এমেলিন ডাকল।

'সোনামণি।'

'আমার ভ্-ভয় করছে।'

কলজেটা মোচড় দিয়ে উঠল বাটনের। হতবুদ্ধি হয়ে গেছে সে ঘটনার আকস্মিকতায়! 'দাঁড়াও, মা'মণি। দেখি, শালটা কোথায় রেখেছি। এই যে পেয়েছি–এটা দিয়ে জড়িয়ে দিচ্ছি।'

'শাল লাগবে না,' অস্ফুটে বলল এমেলিন, 'তোমার কোটই অনেক গরম। আমার ভয় লাগছে, তুমি খালি কোট দিচ্ছ, শাল দিচ্ছ–' অভিমানে জড়িয়ে গেল এমেলিনের গলা।

নিথর হয়ে গেল বুড়ো। হঠাৎ কোথা দিয়ে যে কী হয়ে গেল! বাচ্চাগুলোর জন্য উৎকণ্ঠায় দিশেহারা হয়ে পড়েছে সে ভেতরে ভেতরে। মি. লেস্ট্রেঞ্জ নেই, এখন এই অবোধ শিশু দুটির দায়িত্ব তার ওপর। ভাবতে গিয়ে ঘেমে উঠল বাটন।

'কোন ভয় নেই, মা'মণি। আমি আছি না?' কোনরকমে ঢোক গিলে বলল বাটন। ভেতরে ভেতরে সে-ও কি কম ভয় পেয়েছে?

অনেকক্ষণ চুপচাপ। শুধু বৈঠা টানার শব্দ ঘন কুয়াশা আর আঁধারের মাঝে জেগে আছে।

'ডিকি,' অস্বস্তি কাটানোর জন্য ডাকল বাটন।

'এই যে–,'

'শীত করছে না তোমার?'

'বাবার কোটের মধ্যে ঢুকে আছি আমি,' বেশ সপ্রতিভ গলায় জবাব দিল ডিক।

'আচ্ছা খোকা-খুকুরা, তোমাদের খিদে পায়নি?'

'না।' বলল ডিক, 'শুধু ঘুম পাচ্ছে।'

'তাহলে নৌকার খোলের মধ্যে চলে যাও। শালটা দিয়ে

বালিশ–'

'শালটা তুমি পরো। তোমার শীত করে না?'

হো হো করে হেসে উঠল বুড়ো। 'বৈঠা চালিয়ে এমনিতেই গরম হয়ে আছি আমি।'

'আমি ঘুমোব না,' আপত্তি তুলল এমেলিন।

'লক্ষ্মী মা–'

'কাক্কু আসুক, তারপর।'

ঝিমঝিম করে উঠল বুড়োর মাথা।

'কিন্তু চোখ বন্ধ না করে থাকলে বিলি উইনকার পরী তোমাদের চোখে ধুলো ছিটোবে।'

শিউরে উঠল এমেলিন। আপনা-আপনি চোখ বন্ধ হয়ে এল ওর। বৈঠা চালাতে চালাতে একটা প্রায় ভুলে যাওয়া ঘুমপাড়ানি গান এলোপাতাড়ি ভাবে গাইতে লাগল বাটন।

'ঘুমিয়েছে,' ডিক বলল।

'আস্তে, চুপ। এখন তুমি ঘুমোও, লক্ষ্মী বাপ,' ফিসফিসিয়ে বলল বাটন। তারপর কাঁকড়ার মত নিঃশব্দে এগিয়ে গেল সামনের দিকে। হাতড়ে তামাক, পাইপ আর চকমকির খোঁজ করল। নেই। ওহ্‌হো! ওগুলো তো কোটের পকেটে! নাহ্‌, এমেলিনের ঘুম ভাঙিয়ে কাজ নেই।

রাত অনেক।

কুয়াশার সাথে মিশে দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে আঁধার। বৈঠাটা পর্যন্ত পুরোপুরি দেখতে পাচ্ছে না বাটন। নৌকো ভেসে চলেছে স্রোতের টানে।

ডানবেগ উপসাগরে, আচিল উপকূলের অদূরে এই অবস্থায় মৎস্যকন্যারা খেলা করে বেড়ায়। হেসে-খেলে আর ডাকাডাকি

AMARBOI.COM

করে কুয়াশার মাঝে জেলেদের পথ ভুলিয়ে দেয়। ওদের সবুজ চুল আর দাঁত, কোমর থেকে মাছের মত লেজ। হাতের বদলে ডানা। সবগুলো কিন্তু শয়তানি না। ভয়ে কেঁপে কেঁপে উঠল বাটন। যেন কাছে পিঠেই ওরা আছে। দেখতে পাচ্ছে ওকে। ও একা। খোলা সমুদ্র। ভাবতে গিয়ে সড়সড় করে দাঁড়িয়ে গেল ওর ঘাড়ের কাছের চুলগুলো। বাচ্চা ডিককে জাগিয়ে তোলার প্রচণ্ড ইচ্ছেটাকে টুঁটি চেপে ধরল। ছিঃ, কী লজ্জা! বৈঠা বাওয়া শুরু করল সে আবার। নীরব প্রকৃতি। শুধু বৈঠার জলকাটার শব্দ। ছলাৎ-ছলাৎ, ছলাৎ-ছলাৎ।

'মি. লেস্ট্রেঞ্জ? মি. লেস্ট্রেঞ্জ–ক্যাপ্টেন–,' হঠাৎ কি এক প্রেরণায় প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠল বাটন। ভুলে গেল বাচ্চা দুটোর জেগে ওঠার কথা। অপার্থিব স্বরে চিৎকার করছে সে।

ডাকতে ডাকতে গলা বসে গেল। সাড়া নেই। ক্লান্ত বাটন হাঁপাচ্ছে। দু'চোখ বেয়ে নেমে আসছে জল। অঝোর ধারে।

'আরে!' ধড়মড় করে উঠে বসল বাটন। 'কখন ঘুমিয়ে পড়েছি আমি?' চোখ রগড়ে নিয়ে চারপাশটা দেখল সে। রাত। আকাশে চাঁদ। চকচক করছে। মৃদুমন্দ বাতাস বইছে। কুয়াশার অস্তিত্ব নেই।

'মি. বাটন!' বৈঠায় হাত বাড়াতে গিয়ে শুনল সে ক্ষীণ বিস্মিত কণ্ঠস্বরটা।

'কি সোনা।'

'আমরা এখন কোথায়?'

'সমুদ্দুরে, মণি।'

'কাক্কু কোথায়?'

'বড় নৌকোয়। এখনি আসবে।'

'তেষ্টা পেয়েছে।'

পিপে থেকে পানি ঢেলে এগিয়ে দিল বাটন। পাইপ আর তামাক বের করে নিল এমেলিনের গায়ে জড়ানো কোটের পকেট থেকে। খানিকক্ষণ চুপচাপ।

'এম,' পাইপে আয়েশ করে একটা টান দিয়ে ডাকল বাটন। সাড়া নেই। ঝকঝকে চাঁদের আলো খোলের ভেতর কাত হয়ে ঢুকেছে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলল সেদিকে বাটন। আবার ঘুমিয়ে পড়েছে এমেলিন। চাঁদের কিরণ লেগে ঝলমল করছে চাঁদ-মুখ। স্বর্গকন্যার মত মনে হলো তাকে বাটনের। পাইপ টানতে টানতে উঠে দাঁড়াল বাটন। চন্দ্রালোকে প্লাবিত সাগর। দিগন্ত নেই। দিক্‌চিহ্নহীন। কেউ নেই, কিছু নেই। 'ওরা কোথায়?' বিড়বিড় করল বুড়ো। খোলা নৌকা থেকে চাঁদের আলোয় ভরা সাগরে দিগন্ত খুঁজে পাওয়া মুশকিল। সকালে চেষ্টা করা যাবে। সমুদ্রের রহস্যময় স্রোতগুলো এমনই যে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই একটা নৌকা থেকে আরেকটাকে বহুদূরে নিতে পারে। সামান্য উষ্ণ বাতাস চাঁদের আলো আর নক্ষত্রের সঙ্গে মিশে গিয়ে জলের ওপর বয়ে যাচ্ছে। হ্রদের মত স্থির সমুদ্র। এখান থেকে সবচেয়ে কাছের ভূখণ্ড হয়তো হাজার মাইল দূরে। নক্ষত্রের চাঁদোয়ার নিচে পাইপ টানছে আর ভাবছে বাটন। 'ক্যালো' জাহাজের আলো ঝলমল পানশালা। তেলঢালা জলের মাঝে এক বন্দর থেকে আরেক বন্দরে ছুটছে সাম্পান–কাঁচ পোকার মত। ম্যাকাওর আলোকমালা–লন্ডনের ডক। জাহাজের ঘুমোবার গর্ত আর খোলে রাত কাটানো। 'জ্যাক র‍্যাফারটি' জাহাজের ঘটনা এখনও জ্বলজ্বল করছে চোখের সামনে। খুন করেছিল হার্ডি তার পরম বন্ধুকে জাহাজের খোলে। র‍্যাড নিজের রক্তাক্ত মুখের ওপর লম্ফ ধরে কাঁদছে হার্ডি। 'শপথ করেছিলাম তাই বাধ্য হয়ে খুন করেছি ওকে,' পুলিশের ধমকের জবাব দিয়েছিল হার্ডি। 'ওয়াদা খেলাপ আমি করি না,' বলেছিল সে কাঁদতে কাঁদতে। কবে সে পয়লা

জাহাজে উঠেছিল–মনে নেই বাটনের। জাহাজটার নামটা মনে নেই, শুধু মনে আছে বাল্টিক সমুদ্রে এক কনকনে শীতে কষ্টে যন্ত্রণায় কাঁদছিল সে। একটা মোটা দড়ির শেষ মাথা দিয়ে মেরে মেরে তাকে চুপ করাচ্ছিল জাহাজের নিষ্ঠুর ক্যাপ্টেন। পাইপ টানছে বাটন বুঁদ হয়ে। মাথার ওপর জ্বলছে আকাশ-প্রদীপ। মাতাল বাটনকে মনে পড়ছে ওর। পাম গাছের ছায়ায় ঘেরা বন্দর। মাতালকে নিয়ে হুল্লোড়, হাসাহাসি। সে সব কি ও পরোয়া করে? আহ্! সেই সব জলবেশ্যাদের কি ভুলতে পারে বাটন? এক সময় কাঁধ ঝুলে পড়ল তার। ঘুমিয়ে পড়ল সে।

ঘুম ভাঙল যখন, চাঁদ আকাশে নেই। পুব আকাশে পতঙ্গের মত একটুকরো আলো। নিভে গেল। তারপর হঠাৎই যেন ধাক্কা মেরে জেগে উঠল পেন্সিলে টানা একটা আগুনের দাগ পুব দিগন্তে। গোলাপের পাপড়ির মত আশ্চর্য সুন্দর হয়ে উঠল পুবের আকাশ। একটার সাথে আরেকটা জোড়া লেগে লেগে বেড়ে উঠে যেন বিশাল একটা ফোঁটা। আকাশের নীলে সোনার সূর্যের বসতি। হৃদয়ে সংগীতের ধ্বনি তোলা আলো। দিন শুরু।

'বাপি।' সূর্যের আলো লেগে ঘুম ভেঙেছে ডিকের। 'আমরা কোথায়?' চোখ রগড়াতে রগড়াতে বলল ডিক।

'সব ঠিক আছে, ডিকি, মেরে বেটা,' চেঁচিয়ে বলল বাটন। দাঁড়িয়ে আছে সে। হাত কপালে রেখে সূর্যের তীব্র আলো ঠেকাচ্ছে তার দৃষ্টি খুঁজছে কিছু। 'ডিকি, তোমার আব্বু অন্য জাহাজ নিয়ে এখুনি এসে পড়বে। এম, জেগে গেছ?'

বাটনের কোটের ভেতর থেকে মাথা নাড়ল এমেলিন। কোন কথা বলল না। কাক্কুর কথা জিজ্ঞেস করার ইচ্ছে ওর নেই। কি জবাব দেবে বাটন জানে সে। এমেলিনের মাথায় একটা পুরানো টুপি। ডিকের। মিসেস স্ট্যানার্ড তার মাথায় পরিয়ে দিয়েছিল

তাড়াহুড়োয়। টুপিটা মাথার একপাশে হেলানো। সোনারোদ সকালে ছোট্ট শরীরটা অদ্ভুত মনোরম দেখাচ্ছে। এমেলিন ডিকের পাশে বসে আছে। বাতাসে উড়ছে ওর সোনালি চুল।

'কি মজা!' চেঁচিয়ে উঠল ডিক। একটুকরো কাঠ দিয়ে পানিতে থাবড়া মারছিল সে। 'প্যাডি, আমি মাঝি হব।'

'হুম্!' পাইপে টান দিয়ে বলল, 'তা তো বটেই।'

'তাহলে নৌকোটা চালাতে দাও আমাকে।'

'সেরেছে,' মনে মনে বলল প্যাডি। 'আগে শিখতে হবে তারপর।'

'তাহলে শিখিয়ে দাও।'

'এখন না,' তারপর হঠাৎ ব্যস্তভাবে বলল, 'স্থির হয়ে বসো দেখি। গামছা-টামছা তো নেই—লোনা পানিতে তোমার মুখ ধুয়ে দিই। রোদ্দুরে শুকোবে।'

একটা পাত্রে সাগরের পানি তুলল সে।

'না, আমি মুখ ধোব না,' ডিক প্রতিবাদ জানায়।

'এই নোংরা মুখ নিয়ে কোথাও যেতে আছে,' তিরস্কার করল বাটন। 'বাটির জলে মুখ ডুবাও দেখি?'

'তুমি ডুবাও,' হুকুম দিল ডিক।

তাড়াতাড়ি বাটন বাটির পানিতে মুখ ডুবাল। ডুবিয়েই রইল। খানিক বাদে বু—ভু—বু—ভু—উ—উ শব্দ উঠল সেখান থেকে। খিল খিল করে হেসে উঠল এমেলিন। যোগ দিল ডিক। মুখ তুলে হো হো শব্দে হাসতে হাসতে বাটন ফেলে দিল বাটির পানি।

'পানি ফেলে দিলে যে?' হাসি থামিয়ে বলল ডিক।

'সমুদ্দুরে কত জল।'

'উঁহু, মুখ ধোবার জল শেষ—' হাত উল্টিয়ে বোঝাল ডিক।

'তাই তো?' চিন্তার রেখা ফুটল বাটনের কপালে। 'তাহলে?'

'মুখ আমার ধুতেই হবে।'

'আমারও,' গলা মেলাল এমেলিন। গালে হাত দিল বাটন। যেন মহাচিন্তায় পড়েছে।

'পেয়েছি!' হঠাৎ হাতে তালি দিল ও। 'হাঙর মামাকে বলতে হবে।'

'হাঙর মামা!' লাফিয়ে উঠল এমেলিন।

'হ্যাঁ! তোমরা বসো, আমি ডাকছি ওদের।' বোটের একপাশে ঝুঁকে পানির কাছে মুখ নিয়ে গেল বাটন। 'আছ নাকি তোমরা?' কান পেতে এমন ভঙ্গি করেছে যেন হাঙরদের উত্তর শোনার জন্য উৎকর্ণ হয়ে আছে সে। ঝুঁকে পড়ল ডিক আর এমেলিন। উত্তেজনায় টান টান হয়ে গেছে ওদের শরীরের পেশীগুলো।

'কোথায় গেলে, মামুরা?' হাঁক ছাড়ল বাটন, 'ঘুমুচ্ছ নাকি? হ্যাঁ, এসে গেছ। এখানে তোমার ভাগ্নের মুখ নোংরা। এক বাটি পানি নেব? ওহ্, ধন্যবাদ। নিলাম তাহলে?'

'কী বলল হাঙর?' এমেলিনের চোখে কৌতূহল।

'বলল, "এক পিপেই নাও না।" এখন ডানায় মুখ গুঁজে ঘুমোতে গেল। নাক ডাকা শুনতে পাওনি?'

'প্যাডি! আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে,' মুখ ধুয়েই বলল ডিক। ব্যস্ত হয়ে পড়ল বাটন। ইয়া বড় বিস্কুটের বস্তা থেকে নিল বিস্কুট। মুখবন্ধ টিন থেকে বের করল সার্ডিন। পাটাতনে রাখল সে এগুলো। এমেলিনের কাছে আছে কমলালেবু। ভাল জমল খাওয়াটা।

প্রশান্ত মহাসাগরের জলের রঙ নীল। সকালের নীল রঙ বড় মধুর, অস্পষ্ট উজ্জ্বল। যেন এখনি জন্ম নিল। যেন স্বর্গের নীলিমা। যৌবন দৃপ্ত।

'কি দেখছ, প্যাডি?' মাস্তুলে হাত রেখে বিশাল সমুদ্রের দিকে চেয়ে আছে সে।

'সী-গাল,' এড়িয়ে গেল সে আসল কথাটা।

নৌকোয় পাল খাটিয়ে নিয়েছে বাটন। হাল ধরে বসে আছে রাজকীয় ভঙ্গিতে, মুখে জ্বলন্ত পাইপ। নৌকো এগিয়ে চলেছে বাতাসের ছোঁয়ায়। দুটি শিশুকে নিয়ে চলেছে যেন গ্রীষ্মকালীন প্রমোদ-ভ্রমণে। তার মুখে ফুর্তির ছাপ। আনন্দের স্রোত বইছে নৌকোয়। 'মি. লেস্ট্রেঞ্জের আসতে একটু দেরিই হবে,' বলে ওদের বুঝিয়েছে সে। এমেলিন তার ন্যাকড়ার পুতুলের পরিচর্যায় ব্যস্ত।

পুতুলটি বিচিত্র। মুখটা কালি লেপা, আকারবিহীন। একটা হাত নেই। দেহগত ও শৈল্পিক দিক দিয়ে এর জুড়ি মেলা ভার। একে বদলে এমেলিন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ পুতুল নিতেও রাজি নয়। ডিক ঝুঁকে আছে পানির ওপর মাছ দেখার আশায়।

'মি. বাটন!' পুতুলটাকে নিয়েই অনেকক্ষণ চেয়ে ছিল এমেলিন বাটনের দিকে। 'তুমি তামাক খাও কেন? কী গন্ধ!'

'অ্যাঁ, মা মণি! তোমার কষ্ট হয়? জব্দ করার জন্য খাই, মা, ওটা।'

'জব্দ! কাকে?'

'আমাকে, মা, আমার ভেতরের কষ্টগুলোকে।'

'ও–' কী যেন বুঝে চুপ মেরে গেল এমেলিন।

'হুপ!' ডিক চেঁচিয়ে ওঠে, 'প্যাডি, দেখো দেখো!' একটা অ্যালবাকোর উজ্জ্বল সমুদ্র থেকে লাফিয়ে উঠে ডিগবাজি খেয়ে চলে গেল পানির ভেতর।

'ওটা একটা অ্যালবাকোর। তাড়া করেছে ওকে।'

'কে, প্যাডি?' পুতুল খেলা ছেড়ে এগিয়ে এসেছে এমেলিন।

'কে আবার? গিবলি–গিবলি–আম্‌স্‌।'

সে আবার কি?–জিজ্ঞেস করার আগেই রূপালী তীরের মত এক ঝাঁক মাথা নৌকোর পাশ দিয়ে জল ছিটিয়ে হিস্‌ হিস্‌ শব্দে চলে গেল।

AMARBOI.COM

'ওগুলো?' বিস্ময়ে থ খেয়ে গেছে ডিক।

'উড়ুক্কু মাছ।'

'মাছ ওড়ে নাকি?'

'হুঁ–উঁ–উঁ।'

'ওগুলোকে কি গিবলি–আমস্ তাড়া করেছে?'

'না। বিলি বেলুন।'

হঠাৎ কি মনে পড়তে কথার ফাঁকেই এমেলিন নৌকোর মাঝখানে চলে এল তাড়াতাড়ি। পাটাতনের নিচে উঁকি দিল। ঠিক আছে। শালে জড়ানো ওর বাক্সটা।

প্রায় প্রতি ঘণ্টায় আলসেমি ঝেড়ে ফেলে উঠে দাঁড়ায় বাটন। চোখ মেলে খোঁজে সী-গাল। নাহ্, প্রাণের কোন সাড়া নেই। সমুদ্রটা যেন প্রাগৈতিহাসিক আমলের। ডিক আঝে-মধ্যেই ছটফট করে উঠেছে। কতভাবে আর ফাঁকি দেয়া যায়? শেষে একটা বাঁকানো পিন আর কিছু সুতো দিয়ে মাছ ধরবার সরঞ্জাম বানিয়ে দিয়েছে ডিককে। সাথে সাথে উসকে দিয়েছে মাছ ধরতে পারলে পিকনিক হবে। এখন মাছ ধরছে ডিক পরম উৎসাহে।

'একটা গল্প শোনাও তো, মি. বাটন,' বাক্সটা গুছিয়ে রেখে মাথা তুলে বলল এমেলিন।

'অ্যাঁ! গল্প?'

'হুঁ!'

'উঁ উঁ–'

'উঁ, উঁ–কী? গল্প বলো?'

হো হো করে হেসে ওঠে বাটন।

'ডিল গ্রামের কোন অভাব নেই। সোনালী ফসল হত, চির বসন্তের দেশ সেটা। সেথায় আমার এক খালাতো বোনের বিয়ে হলো এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়র সাথে–'

'ওমা! সত্যি!' খুশিতে উচ্ছল হয়ে উঠল এমেলিন।

'হুঁ। স্বামীর সাথে সুখের সংসার বোনের, ওদের ঘরে জন্মাল সুন্দর মেয়ে হানা। কী সুন্দর তার চেহারা। ঠিক তোমার পুতুলটার মত।'

'তাই?' মন্ত্রমুগ্ধ শ্রোতা বিস্ময় প্রকাশ করল।

'হ্যাঁ। হানার জন্ম হয়েছিল দাঁত নিয়ে। জন্মেই হানা কামড়ে দিয়েছিল ডাক্তারকে।'

'বাব্বাহ্! ভারি দুষ্টু,' হানার দুষ্টুমিতে ভীষণ মজা পেয়েছে যেন এমেলিন। 'মিসেস জেমসের একটা অ্যাত্তুটুকু বাচ্চা হয়েছিল।' হাত দিয়ে আকারটা দেখাল সে, 'একেবারে গোলাপী রঙের।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ,' বাটন বলল, 'প্রথমে সব বাচ্চাই ওরকম হয়। ধুয়ে নেবার পর গোলাপী আভাটা চলে যায়।'

'তা হবে,' গম্ভীর স্বরে বলে এমেলিন, 'কিন্তু ওই বাচ্চাটার তো দাঁত হয়নি। আমি ওর মুখে আঙুল পুরে দেখেছি। মিসেস জেম্‌স তাইতেই বুঝি অত কাঁদছিল?'

'হ্যাঁ।'

'ডাক্তার ওকে ব্যাগে করে নিয়ে এসেছিল তো, তাইতে। তারপর ওকে আবার সারের গাদায় ঢুকিয়ে দিয়েছিল!' মাছ ধরবার ব্যর্থ চেষ্টা চালাতে চালাতে বলল ডিক। গল্প শুনছিল সে।

'আহ্,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল এমেলিন, 'আমার যদি একটা বাচ্চা থাকত আমি ওকে কোনদিন সারের গাদায় পুঁতে দিতাম না।'

'ডাক্তারসাহেব বাচ্চাটাকে পুঁতে দিলেন। মিসেস জেমস কাঁদছিলেন। বাবাকে জিজ্ঞেস করলাম। বললেন, ওকে পুঁতে দেওয়া হয়েছে যেন এক দেবদূত হয়ে আসে।'

অবাক হয়ে শুনছিল বুড়ো। ব্যাপারটা বোধগম্য হলো এতক্ষণে।

'দেবদূতদের ডানা আছে, তাই না?' স্বপ্নালু গলায় বলল

AMARBOI.COM

এমেলিন।

'আমি রাঁধুনিকে বললাম,' গল্প শেষ হয়নি ডিকের; 'সে আবার জেনকে বলল। বাচ্চাদের নাকি নাড়িভুঁড়ি ফেলে দিয়ে খড় পুরে দেয়, জেন বলল আমাকে। আমি বাবাকে বললাম, "বাপি, আমি ওরকম বাচ্চা বানানো দেখব।" বাপি তখনি রাঁধুনিকে তাড়িয়ে দিলেন।'

'রাঁধুনির তিনটে বড় ট্রাংক আর মাথার টুপির জন্য একটা বাক্স ছিল,' পুরানো কথা মনে পড়ে গেছে এমেলিনের।

'তারপর?' শুধায় বাটন।

'তারপর? তারপর ঘোড়াগাড়ির কোচম্যান বলল এত ট্রাংক আঁটবে না। এই যাহ্! ওদিকে রাঁধুনি তোতা পাখির খাঁচা গাড়িতে ফেলে এসেছে ভুলে।'

'আমার যদি খাঁচায় পোরা একটা তোতা পাখি থাকত?' পালের নিচে ছায়ায় বসতে বসতে আফসোস করল এমেলিন।

'তোতা পাখি? তোতা পাখি দিয়ে করবেটা কি তুমি?' বাটন শুধোয়।

'ওকে আমি ছেড়ে দিতাম,' উজ্জ্বল মুখ তুলে চাইল এমেলিন।

'তোমার ওই কথা শুনে আমার দাদুর কথা মনে এল। দাদুর ছিল বুড়ো একটা শুয়োর।' গম্ভীর গলায় বলে চলেছে বাটন। 'শুয়োরটার খাঁচার কাছে গেলে নাক দিয়ে ঢুঁস মারত আমায়। আর শুয়োরের ভাষায় বলত—"আমায় বের করে দাও, তোমায় রুপোর টাকা দেব একটা।" আমি বলতাম, "দরজার নিচ দিয়ে বেরিয়ে এসো।" লম্বা নাকটা গলিয়ে দিত সে দরজার ফাঁকে। আমি একটা কাঠি দিয়ে ছিটকিনি খুলে দিতাম। বেরিয়ে এসেই বদমাশ হৈ হৈ করে চেঁচাত। মা ছুটে আসতেন লাঠি নিয়ে। বেদম পেটাতেন আমায়।'

'উহ্! কী সুন্দর গল্প!' আটকে রাখা দম ছাড়ল এমেলিন।

AMARBOI.COM

'তারপর?'

বেলা এগারোটায় দুপুরের খাওয়া সারল ওরা। পাল তুলে তাঁবুর মতু একটা ঢাকনা তৈরি করল। বাচ্চারা যাতে সূর্যের তেজ থেকে রক্ষা পায়। সূর্য মাথার উপর উঠছে। বিভীষিকা বাড়ছে বাটনের। সূর্যের প্রতিবিম্ব পড়ে সাগরটা যেন ঝলকে উঠছে। চোখ ধাঁধানো প্রতিফলন। ডিকের খড়ের টুপিটা মুখের ওপর ঢাকনি করে শুয়ে পড়ল বাটন নৌকোর মাঝখানে। খানিক বাদেই নাক ডাকার শব্দ নির্জন সমুদ্রের বাতাস কাঁপিয়ে দিল।

ঘুমিয়ে ছিল বাটন। ভেঙে গেল ঘুম, একটা একটানা ভয়ার্ত চিৎকারের শব্দে। প্রথমে চোখের পাতা খুলল, পরে ধড়মড় করে উঠে বসল। এমেলিন চেঁচাচ্ছে। একটা ঝাঁকুনি দিল ওকে বাটন। চোখ মেলল। ঘেমে নেয়ে গেছে সে।

'মি. বাটন!' অস্ফুটে ডাকল এমেলিন।

'কি হয়েছে, মামণি?' ব্যাকুল কণ্ঠে শুধাল বাটন।

'ভয়!' কাঁপা কাঁপা গলায় বলল এমেলিন। 'গিবলি আমস্ ধরতে চাইছিল আমাকে।'

বিমূঢ়ের মত বসে রইল বাটন। সান্ত্বনার ভাষা খুঁজে পাচ্ছে না। খানিকক্ষণ পর মাস্তুল নামিয়ে নিল সে। মাথা হাঁটুতে গুঁজে দিয়ে বসে আছে এমেলিন। দীর্ঘশ্বাস ফেলে দূরে দৃষ্টি মেলে দিল বাটন। এবং চমকে উঠল। মাইল তিনেক দূরে কী ওটা? দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করল। আরে! মনে হচ্ছে কতগুলি গাছের কঙ্কাল। জড়াজড়ি করে আছে একসাথে। অনেকক্ষণ চেয়ে রইল সে ওই দিকে। পলক নেই। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল সে, 'হিপ-হিপ্-হুররে।'

'কি হলো, প্যাডি?' জিজ্ঞেস করল ডিক।

'হিপ-হিপ্-হুররে, হিপ্-হিপ্-হুররে,' চেঁচিয়েই চলেছে বাটন।

চোখে-মুখে বুনো আনন্দ। একটা হাত সটান সামনে বাড়িয়ে দিল। তর্জনী দিয়ে জিনিসটা দেখাল ডিককে।

'কী ওটা?' ঠাহর করতে পারছে না ডিক।

'জাহাজ। জাহাজ,' ওদিকে তাকিয়েই কথা বলছে বাটন, 'ডিক, পালটা দাও তো।'

'ওটা কি বাপির জাহাজ?' ডিকের গলায় উত্তেজনা। নৌকা তর তর করে এগিয়ে চলেছে পাল খাটানোর পর।

'কাছে গেলে জানা যাবে,' বলল বাটন। তার দৃষ্টি জাহাজটার দিকে আটকে গেছে যেন।

'আমরা এখন ওই জাহাজটায় চড়ব, না?' এমেলিন শুধাল।

'হ্যাঁ, সোনামণি।'

জাহাজটা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। দুই মাস্তুলওয়ালা জাহাজ। গাছের গুঁড়ি দিয়ে তৈরি মাস্তুল। ছেঁড়া পালের অংশবিশেষ ঝুলছে এখনও। বাটনের অভিজ্ঞ চোখ খুব শিগগির আবিষ্কার করল ওটা একটা পথহারা জাহাজ।

'জাহাজটা থেকে লোক চলে গেছে,' বিড় বিড় করে বলল বাটন, 'হায় কপাল! একেবারে ফাঁকা!'

গলুইয়ে বসে ডিকও লক্ষ করছে জাহাজটাকে। চোখ জ্বলজ্বল করছে ওর। 'কই?' চেঁচিয়ে উঠল ডিক, 'কোন লোক নেই, কিছু না। বাপি কই?' ফোঁস করে শ্বাস ছাড়ল সে।

নৌকোটা আরও এগিয়ে নিল বাটন। কুড়ি গজ কেবল দূরত্ব থাকতে খুলে ফেলল মাস্তুল। বৈঠা নিল হাতে।

দ্বি'মাস্তুল জাহাজটার অল্প অংশই জলের ওপর ভাসছে। জাহাজের দড়ি-দড়া যন্ত্রপাতি সবই অগোছাল। ডেকে লুটোচ্ছে টুকরো টুকরো ক্যানভাস। ঝোলানো তারে একটি নৌকোও নেই। সব মিলিয়ে করুণ অবস্থা। জাহাজটা কাঠের তৈরি। বোঝা যাচ্ছে,

ফুটো হয়ে গিয়েছিল কোথাও। প্লাবিত হয়ে যেতে যাত্রীরা চলে গেছে এটাকে ছেড়ে। জাহাজটা এমন সুন্দর ভাবে ভেসে আছে যেন সানফ্রানসিসকো বন্দরে নোঙর ফেলে দাঁড়িয়ে আছে। সবুজ জলে তার ছায়া। তামার পাত বেয়ে উঠেছে জাহাজের আগাছা। জায়গায় জায়গায় রঙ ফুলে আছে ফোস্কার মত। অনেক ক্ষেত্রে পুড়ে গেছে রঙ। যেন ওর মাঝ দিয়ে ঢুকে গেছে গরম লোহার শিক। বড় একটা দড়ি অদৃশ্য হয়ে গেছে ঝুলতে ঝুলতে জলের মাঝে। কয়েকবার বৈঠা চালিয়ে জাহাজের সামনের অংশে নৌকো নিয়ে এল বাটন। জাহাজের নামটা জলে-রোদে অস্পষ্ট হয়ে গেছে। বন্দরের নামটা পড়া যাচ্ছে।

'ওতে কি সব লেখা রয়েছে,' বাটন ডিকের দিকে ফিরে বলল, 'পড়তে পারছি না আমি। মূর্খ হওয়া মহা ঝামেলা।'

'আমি পড়তে পারি,' ডিক বলল।

'আমিও।' মৃদুস্বরে বলল এমেলিন।

'কি লেখা আছে?' বাটন জিজ্ঞেস করল।

'কোনান ডোআ, মার্থার আঙুর বাগান।'

পুরানো ধরনের পাটাতন জাহাজটির। ভাসছে জলের ওপর। ডিঙি নৌকোটার মাত্র ফুটখানেক উঁচুতে। জাহাজের গায়ে শক্ত করে বাঁধল বাটন নৌকোটাকে। এমেলিনকে ধরল একহাতে। উঠে পড়ল ওপরে। তারপর তুলল বিস্কুটের বস্তা, জলের পাত্র, ক্যান্‌ড্ ফুড। সবশেষে ডিককে।

'কোনান ডোআর ডেক কাঠের তৈরি। বেশ চওড়া। দড়ি-দড়া গুটানো পড়ে আছে। একটা ডেক হাউস রয়েছে কোয়ার্টার ডেক জুড়ে। পচা কাঠ, আলকাতরা আর অজানা গন্ধ ছড়িয়ে আছে জাহাজটায়। একটা ঘণ্টা ঝুলছে মাস্তুল থেকে। লোহার একটা টুকরো কুড়িয়ে নিয়ে ঘণ্টা বাজাতে লাগল ডিক। চিৎকার করে ডিককে ঘণ্টা বাজাতে নিষেধ করল বাটন। কে জানে এই ঘণ্টা

ধ্বনিতে আকৃষ্ট হয়ে কোন অশরীরী যদি সাড়া দিয়ে ফেলে? ঘণ্টা বাজানো বন্ধ করে ডিক দৌড়ে এল ডেক হাউসের দিকে। পেছন পেছন এমেলিন। পরে এল বাটন। ডেক হাউসের দরজাটা হাট করে খোলা। উঁকি দিল দরজার ভিতরে। তিনজন একসাথে। তিনটে জানালা। সূর্যের আলো যেন কান্নার মত ঝরে পড়ছে।

ঘরের মাঝখানে একটা টেবিল। পাশে চেয়ার। চেয়ারটা এমন ভাবে আছে যেন ওটাকে তাড়াতাড়ি ঠেলে উঠে গেছে কেউ। টেবিলে দুটো প্লেট, দুটো কাপ, একটা চায়ের পট। উচ্ছিষ্ট খাবার ছড়িয়ে আছে। একটা প্লেটে একটা কাঁটাচামচ। তাতে মাংসের টুকরো লেগে আছে। যেন কেউ খেতে যাচ্ছিল–তখনই কিছু ঘটে। চায়ের পটের পাশে কনডেন্সড মিল্কের একটা খোলা টিন। চিনি ছড়িয়ে আছে। এমনভাবে যেন চায়ের কাপে চা দেবার সময় ছিটকে গেছে। আচমকা যেন যাদুমন্ত্রে থমকে গেছে সবকিছু। প্রাণহীন পদার্থগুলো যেন কথা বলতে চাইছে। হয়তো জাহাজের ক্যাপ্টেন চা পান শেষ করছিল, খাওয়া শেষ করার মুখে ছিল তার সহকারী। সম্ভবত তখনি আবিষ্কার হয় কোন ছিদ্র। পালিয়ে যায় যাত্রীরা জাহাজ ছেড়ে। কিন্তু একটা ব্যাপার পরিষ্কার। ছোট্ট জাহাজটা ছাড়ার সময় আবহাওয়া ভালই ছিল। নইলে, সাজানো থাকত না জিনিস-পত্র।

বাটন ও ডিক দরজা পেরিয়ে ঢুকল ঘরের ভেতরে। এমেলিন দাঁড়িয়ে থাকল দোরগোড়ায়। কৌতূহল কিন্তু তারও কম নয়। কিন্তু অজানা একটা অনুভূতিতে ছেয়ে আছে ওর মন। জনমানবহীন এই জাহাজে 'অন্য কিছু' নেই তো? দরজার মাঝখানে বসে পড়ল এমেলিন। নিজের পোঁটলাটা পাশে রেখে পকেট থেকে বের করল ন্যাকড়ার পুতুলটা। 'ভয় করিস না, হ্যাঁ!' দরজায় ওটাকে ঠেস দিয়ে বসিয়ে বলল সে।

ডেক হাউসের ভেতরে তেমন কিছু পাওয়া গেল না। ওর

পেছনের অংশে আরও দুটো ছোট ছোট খুপরি। এগুলোতে সম্ভবত ক্যাপ্টেন আর তার সহকারী থাকত। পুরানো জঞ্জাল থেকে যা পাওয়া গেল: পুরানো জামা কাপড়, জুতো, বিচিত্র ধরনের বড় একটা টপ হ্যাট–ওপর দিকটা উঠে গেছে সরু হয়ে, লেন্সহীন টেলিস্কোপ একটা, হয়েটের এক ভলিউম বই, নৈসর্গিক ও স্রোত সম্পর্কে তথ্যসংবলিত পঞ্জিকা, এক বাক্স মাছ ধরবার সরঞ্জাম, একটা করাত। এককোণে যা পাওয়া গেল তার তুলনা নেই–প্রায় দশগজের মত লম্বা কুণ্ডলী পাকানো কালো দড়ির মত জিনিস। ওটা দখল করে বাটন চিৎকার করে উঠল আনন্দে। বন্দরের তামাকের দোকানে টাঙানো থাকতে দেখেছে এ জিনিস। শুয়োরের লেজ। এর এক পাইপ তামাক টানলে একটা হিপোপটেমাসেরও বমি পেয়ে যাবে। কিন্তু প্রাজ্ঞ নাবিকেরা এই জিনিস খইনির মত চিবিয়ে অথবা পাইপে ভরে টেনে মহাসুখ অনুভব করে।

'জিনিসগুলো বের করে ডেকে নিয়ে এসো,' বাটন চেঁচিয়ে বলল ডিককে, 'কোনটা কাজে লাগবে না লাগবে দেখতে হবে।' বলতে বলতে একগাদা জিনিস দু'হাতে বাইরে নিয়ে এল বাটন। ডিক নিয়ে এল সেই টপ হ্যাটটা। ওর চোখে-মুখে খুশি উপচে পড়ছে এই মহামূল্যবান জিনিসটা পেয়ে। সামনে এমেলিনকে দেখে বলল, 'দেখো, কি জিনিস পেয়েছি।' টুপিটা মাথায় পরে নিল ডিক। ওর কাঁধ ছাড়িয়ে নেমে এল সেটা। ভয়ার্ত একটা স্বর বেরিয়ে এল এমেলিনের কণ্ঠ চিরে। ভয় পেয়েছে সে অদ্ভুত ডিককে দেখে। ছিটকে চলে গেল সে রেলিঙ-এর পাশে। পানির একটা পাইপের ওপর বসে বড় বড় চোখ মেলে দেখছে ও ডিককে। দম বন্ধ হয়ে গেছে। কালো জিনিসে বড় ঘেন্না ওর। কালো বিড়াল, কালো কুকুর, কালো ঘোড়া–সহ্যই করতে পারে না। বোস্টনে থাকার সময় একবার কালো ফুল গাছের তৈরি শবাধারের মোমবাতিদান দেখে সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল

সে। এখনও নির্বাক হয়ে আছে সে ভয়ে।

ইতোমধ্যে ডেক হাউস খালি করে ফেলেছে বাটন। রোদ্দুরে ভরা ডেকের ওপর বসে পাইপ টানছে সে। এই নতুন পাওয়া ঈশ্বর প্রদত্ত ঐশ্বর্য নিয়ে এত ব্যস্ত যে, জীবনধারণের জন্যে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় পানি আর খাদ্য জাহাজে আছে কি-না তার সন্ধান নিতে ভুলে গেছে সে। খুঁজলে অবশ্য আলু পেত আধবস্তা রান্নাঘরে। আর ছিল ব্যবহারের অযোগ্য কিছু পানীয় জল।

টুপিটা আর পরবে না, কথা দেবার পর এমেলিন হামাগুড়ি দিয়ে এল ওদের দিকে। এবার তিনজন বসল স্তূপীকৃত জিনিসগুলোর পাশে।

'দেখো এক জোড়া ব্রৌগ।' জুতো জোড়া শূন্যে তুলে পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে দেখছে বাটন। আইরিশ ভাষায় জুতোকে ব্রৌগ বলে। 'দুনিয়ার যে কোন বন্দরে এর দাম আধ ডলার তো দেবেই। ডিক, এই ব্রীচেসটা বের করে লম্বা করে টান করো তো,' ট্রাউজারটা লম্বা করে ধরলে সেটাকে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল বাটন। রেখে দিল একপাশে। 'এই একচোখা টেলিস্কোপটাকে জুতোর পাশে রাখো,' ভাঙা টেলিস্কোপটা বাদ্যযন্ত্রের মত করে ধরে বাটন বলল, 'কোনদিন কাজে আসতে পারে। এই দেখো একটা বই–?' ডিকের দিকে ন্যাভাল টাইমটেবিল বইটা ছুঁড়ে দিয়ে আবার বলল সে, 'এতে কি লেখা আছে বলো তো!'

'পড়তে পারছি না। শুধু নম্বর লেখা।' ডিক বলল।

'ফেলে দাও জলে।'

কথামত কাজ সেরে ডিক আবার বসে পড়ল জিনিসগুলোর পাশে। বাটন টুপিটা দিল মাথায়। হেসে উঠল ডিক আর এমেলিন। এবার ভয় পায়নি এমেলিন। টুপিটা একপাশে রেখে জিনিসগুলো ঘাঁটল সে খানিকক্ষণ। কিছু ফেলে দিল জলে; রেখে দিল কিছু। এতক্ষণে খাবার আর পানির কথা মনে হলো বাটনের।

জলের পাত্র নোনাজলে ভরা। রান্নাঘরের তামার পাত্রে একখণ্ড পচাগলা মাংসের টুকরো পাওয়া গেল।

বাটন রেলিঙ ধরে ঝুঁকে পড়ে ডিঙিটাকে দেখল। বাচ্চা হাঁসের মত মনে হচ্ছে জাহাজটার পাশে। নৌকোটা ঠিকমত বাঁধা আছে কিনা পরীক্ষা করে জাহাজের প্রধান চত্বরে দাঁড়িয়ে সাগরের দিকে তাকিয়ে রইল সে। ভাবছে।

খানিকক্ষণ পর সে অনুভব করল ওর ঘাড়ের কাছে রোমকূপগুলো দাঁড়িয়ে গেছে। ঢিপ্ ঢিপ্ করছে বুকটা। সামনে কি হবে ভেবে ভয় পেয়েছে ও ভীষণ।

'অনেক সময় গেল–বাপি তো এল না?' ডিকের কথায় চমক ভাঙল বাটনের।

ওরা তিনজন বসে আছে রান্নাঘরের দু'পাশে রাখা কাঠের পাঁজার ওপর। সুন্দর জায়গা। সূর্য অস্ত যাচ্ছে। সমুদ্র যেন গলা সোনা। রহস্যময় মরীচিকার মত কাঁপছে জল।

'নিশ্চয়ই আসবে, সোনা। দেরি হচ্ছে একটু,' ধীর গলায় বলল বাটন। ও জানে না কতক্ষণ বাচ্চা দুটোকে ছলনা দিয়ে ভুলিয়ে রাখতে পারবে। 'ওই দেখো, সাগরের ভেতর সূর্য ডুবছে কেমন! চুপটি করে শোনো হিস্ হিস্ শব্দ শুনতে পাবে।'

কল্পনাশক্তির জোর থাকলে অবশ্য যে কেউ হিস্ হিস্ শব্দ শুনতে পাবে বাটনের মত। ওরা বিশ্বাস করল বাটনের কথাটা। নির্নিমেষে চেয়ে দেখছে সূর্যটাকে। মুখে কথা নেই। কান খাড়া। বিরাট জ্বলন্ত থালাটা যেন সাগরের পানিকে আলিঙ্গন করল লাফিয়ে পড়ে। জল ছুঁয়ে ঢুকে গেল ভেতরে। নেমে যাচ্ছে যেন সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত। অদৃশ্য হয়ে গেল অবশেষে। সোনালি রঙের ভৌতিক আলো ছড়িয়ে আছে সমুদ্রে। ধীরে ধীরে মুছে যাচ্ছে। এখন সাগরের রঙ বেগুনি। পশ্চিম আকাশ আঁধার হতে মনে হলো

হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল বিশাল দরজাটা। নক্ষত্রেরা ঝাঁপিয়ে পড়ল আকাশে।

'সূর্য কোথায় চলে গেল, প্যাডি?' জিজ্ঞেস করল ডিক।

'চাঁদকে ধরতে। চাঁদ এখন সুন্দর জামা-কাপড় পরে তৈরি হচ্ছে বেরুবার জন্য। চাঁদের পিছু ছুটল বটে সূর্য কিন্তু কোনদিন ধরতে পারল না ওকে।'

'যদি ধরে ফেলে?'

'মজা দেখাবে।'

'কেন, মজা দেখাবে কেন, প্যাডি?'

'চাঁদ মানুষকে খেপিয়ে নিয়ে যায় নিজের দেশে। বেটা আর মেয়েছেলে সক্কলের মাথা নষ্ট করে। যেমনটি করেছিল বাক ম্যাক্‌কানকে।'

'ম্যাক্‌কান আবার কে?'

'ম্যাক্‌কান? আমার গাঁয়ে থাকত, ছেলেবেলার খেলার সাথী।'

'কি হয়েছিল তার?'

'ম্যাক্‌কান চাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকত ঘাসে শুয়ে,' গল্প শুরু করল বাটন। 'আবার কখনও পাহাড়ের মাথায় চড়ত চাঁদকে ধরার জন্য। এমনও দিন গেছে ম্যাককানকে দু'তিন দিন পর খুঁজে পাওয়া গেছে বনের ভেতর। ওকে বাড়ির লোকেরা বেঁধে রাখল শেষে। সেখান থেকেও পালাল দুনিয়ার চালাক ছেলেটা। একরাতে–,' দুই বাচ্চা আগ্রহভরে শুনছে তার গল্প। 'আমার বড় ভাই টিম বসেছিল আগুনের ধারে, এমন সময় বাক এল পা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। "টিম!" সে উত্তেজিত স্বরে বলল, "ধরেছি ওকে।"

' "কাকে?" টিম শুধায়।

' "চাঁদ!" বলল বাক।

' "কোথায়?"

AMARBOI.COM

' "পুকুরের ধারে, বাল্‌তির মধ্যে। দেখলে এসো।"

'টিম গেল ওর সাথে। সত্যিই বাল্‌তির পানিতে ঝলমল করছে চাঁদ।'

'সত্যি!' চোখ বড় হয়ে গেছে এমেলিনের।

'সত্যি।'

'পুকুরের মধ্যে ছিল এটা।' চাঁদটাকে দেখিয়ে বলল বাক ম্যাককান, "বাল্‌তিতে তুলে এনেছি। এখন জ্যান্ত ধরতে হবে ওকে!" উত্তেজনায় টগবগ্‌ করছে বাক। তুলে নিল বাল্‌তি। কাত করে ফেলতে লাগল পানি, অল্প অল্প করে, সাবধানে। কিন্তু চাঁদ পালিয়ে গেল হঠাৎ।

' "ফের ধরো," টিম বলল।

'বাক বাল্‌তিতে পানি ভরল। জল স্থির হতে উঁকি দিল চাঁদ। ম্যাককান খুশিতে বাগ বাগ।'

' "এবার খুব ধীরে ধীরে জল ফেলো। নইলে আবার পালাবে চাঁদ।" আমার বড় ভাই টিম বলল।

' "এক মিনিট," বাক কি যেন ভাবল। বলল, "এবার আর পালাতে দেব না ওকে।" খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বাড়ি গেল সে। একটা ছাঁকুনি নিয়ে ফিরল খানিকক্ষণ পর।

' "তুই ছাঁকুনিটা ধর।" বাক বলল টিমকে, "বাল্‌তির পানি ঢালছি। এবার আটকে যাবে ছাঁকুনির মধ্যে।" খুব সাবধানে জল ঢালল বাক। "পালিয়েছে! ফের পালিয়েছে," চেঁচিয়ে উঠল বাক। শেষে রেগে-মেগে বাল্‌তি আর ছাঁকুনি ফেলে দিল পুকুরে। খানিকক্ষণ পর লাঠিতে ভর দিয়ে এল বাকের মা। জিজ্ঞেস করল, "বাল্‌তি কোথায় আমার?"

' "পুকুরে," বাক বলল।

' "ছাঁকুনি?"

' "বালতির সাথে, পুকুরে।"

'বুড়ি মা চেঁচিয়ে কাঁদল, গালাগাল করল, লাঠি দিয়ে পেটাল। বাক ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে কাঁদতে লাগল। বাকের মা ওকে ধরে আবার বন্দী করল ঘরে। হপ্তাভর শুধু পানি আর শুকনো রুটি খেতে দিল। যাতে মাথা থেকে চাঁদ বেরোয়। কিন্তু বৃথা। পরের মাসে ফের মাথার ওপর চাঁদ উঠল–ওই যে দ্যাখো, চাঁদ উঠছে।'

রুপোলি চাঁদ তার সৌন্দর্য নিয়ে জল ঠেলে উঠছে। ফরসা দিনের মত আলো ছড়িয়ে আছে চারধারে। রান্নাঘরের কাঠের দেয়ালে ডিক, এমেলিন আর বাটনের অদ্ভুত ছায়া যেন কালো নক্সা আঁকছে।

'দেখো, আমাদের ছায়াগুলিকে দেখো!' মাথার টুপি নাড়তে নাড়তে ডিক চেঁচিয়ে ওঠে।

এমেলিন তার পুতুলটাকে তুলে ধরল ছায়া দেখাবার জন্য। বাটন পাইপ উঁচিয়ে ধরল। তারপর মুখে ঝুলিয়ে বলল, 'চলো, বাছারা, এবার ঘুমুতে চলো।'

'আমার ঘুম পায়নি, প্যাড্রি,' ডিক বলল, 'আরেকটু থাকো।'

'ঠিক আছে। পাইপ শেষ হবার পর এক সেকেন্ডও দেরি নয় কিন্তু।'

'তাহলে আবার তামাক ভরে নাও।'

বাটন জবাব না দিয়ে পাইপ টানতে থাকে।

'মি. বাটন,' এমেলিন ডাকল।

'কি, সোনামণি।'

'একটা গন্ধ পাচ্ছি আমি।' শুয়োরের লেজের কটুগন্ধ ছাড়িয়ে অন্য কিছুর সৌরভ সে পাচ্ছে।

'কিসের?'

'খুব সুন্দর আর মিষ্টি।'

'কই, আমি কেন পাচ্ছি না?' নাক উঁচু করে টানতে টানতে বলল ডিক।

'ফুলের গন্ধ।' ভাল করে বাতাসে ঘ্রাণ নিয়ে এমেলিন বলল।

দুপুর থেকে বাতাসের গতিপথ অনেকবারই পরিবর্তিত হয়েছে। এখানকার বাতাসে খুব মৃদু, হালকা সুগন্ধ বহু দূর থেকে ভেসে আসছিল। কিন্তু, তীক্ষ্ণ ঘ্রাণশক্তিসম্পন্ন না হলে এই গন্ধ পাবার কথা নয়।

'ফুলের গন্ধ!' জুতোর হিলে পাইপের পোড়া তামাক ঝাড়তে ঝাড়তে বাটন বলে, 'সমুদ্দুরের মাঝখানে ফুলের গন্ধ? তুমি স্বপ্ন দেখছ। চলো চলো। ঘুমুতে চলো।' তাড়া দিল বাটন। কাঠের স্তূপ থেকে উঠে দাঁড়াল ওরা। দু'জনকে দু'হাতে ধরে বাটন এগোতে থাকে। ঘণ্টাটার পাশ দিয়ে যাবার সময় ডিক লাঠিটা তুলে ঘণ্টায় আঘাত করল আচমকা। জোরেশোরে বুক কেঁপে গেল ওদের। রাতের নিস্তব্ধতা চিরে ঘণ্টাধ্বনি মিলিয়ে গেল ধীরে ধীরে।

ওরা ঘুমিয়ে পড়েছে। জেগে আছে বাটন। রেলিঙে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছে সে ফুলের গন্ধের কথা। সত্যিই কি এমেলিন ফুলের গন্ধ পেয়েছে? চন্দ্রালোকিত ডেকের পাটাতনের তক্তাগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে ও। শূন্য ডেক আর দড়িদড়ার ভৌতিক ছায়ার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে চোখ পড়ল ওর রান্নাঘরের খোলা দরজার দিকে। চমকে উঠল সে। ওই দরজা দিয়ে যদি বেরিয়ে আসে কোন অশরীরী ছায়ামূর্তি? ভয়ে হিম হয়ে গেল সে। দ্রুত ডেক হাউসের ভিতর ঢুকে বাচ্চাদের পাশে শুয়ে পড়ল। নাক ডাকার শব্দ এল কয়েক সেকেন্ড পরেই।

সারারাত ধরে ছোট্ট জাহাজটি প্রশান্ত মহাসাগরের মৃদু ঢেউ-এর দোলানিতে দুলতে থাকল। বাতাসের সাথে ভেসে আসছে মিষ্টি ফুলের গন্ধ।

AMARBOI.COM

দুই

'খোকা খুকু–' বাটন চিৎকার করে ওঠে, 'একটা দ্বীপ দেখা যাচ্ছে।'

সকালের পরিপূর্ণ রোদ্দুরে ডেকে দাঁড়িয়ে আছে ওরা তিনজন। অনেক দূরে অস্পষ্ট সবুজের এক টুকরো ছায়া, মিশে আছে দিগন্তের সাথে। গভীর আগ্রহ নিয়ে দেখছে ওটাকে ডিক আর এমেলিন। সরে পড়ল বাটন। জাহাজ ছাড়বার প্রস্তুতি নিতে হবে। ওদের খাবার ব্যবস্থা করল প্রথমে। তারপর একটা বিস্কুট চিবুতে চিবুতে ডেকময় ঘুরে ঘুরে জিনিসপত্র সংগ্রহ করল। ওগুলো তুলল ডিঙিতে। অনেক জিনিসের মধ্যে পাওয়া গেল বেশ কিছু সুঁইসুতো আর আধবস্তা আলু।

সূর্যের আলো আরও উজ্জ্বল হলে দ্বীপের গাছগাছালিও নজরে এল। যেন স্বর্গীয় নীলিমায় এক তৃণ শ্যামল উদ্যান।

'আমরা ওখানে যাব,' বাটন বলল।

দ্বীপ থেকে ছুটে আসছে বাতাস নানান রকমের উদ্ভিদের মিলিত সুগন্ধ নিয়ে।

'কাল রাতে আমি এই গন্ধই পেয়েছিলাম,' বলল এমেলিন।

দ্বীপের পূর্ণ চেহারা নজরে আসছে এখন। ছোট পাহাড়, সবুজ গাছ। কোথাও হালকা, কোথাও ঘন ছায়া। দ্বীপের চারপাশ ঘিরে আছে যেন শ্বেত পাথর। আসলে ডুবোপাহাড়ের ঘা খাওয়া ঢেউয়ের ফেনা ওগুলো। নারকেল গাছে বড় বড় পাতা চোখে

পড়ছে।

কোনান ডোয়া ছাড়ল ওরা। স্রোতের অনুকূলে বৈঠা চালাচ্ছে বাটন। কৌতূহলী ডিকের অগণিত প্রশ্ন এড়িয়ে নিজের ভাবনায় ডুবে আছে সে। দ্বীপে কি লোক আছে? থাকলে কি ভাবে গ্রহণ করবে ওদের? দক্ষিণ সাগরে অনেক বছর কাটিয়েছে সে। সামোয়া, মার্কুসাস দ্বীপের লোকজনেরা ভালই। কিন্তু এখানে?

পাইপ ধরিয়ে শক্ত হাতে হাল ধরে বসে আছে বাটন। একটা দুশ্চিন্তা ঢুকেছে তার মাথায়। ডুবোপাহাড়ের ওপর দিয়ে আছড়ে পড়ছে সমুদ্রের জল। অজস্র ফেনায় ভরে আছে জায়গাটা। তার মাঝখান দিয়ে দ্বীপে যাবার পথ। এই জায়গাটুকু পার হতে পারবে তো নির্বিঘ্নে? যতই এগিয়ে যাচ্ছে সে বাতাসে ভেসে আসছে পাহাড়ের আঘাত লেগে ঢেউ ভাঙার তীব্র সঙ্গীত। এটুকু পার হলেই জনহীন নির্জন সৈকত। সাগরের ঢেউ আছড়ে পড়ছে সেখানে। সী-গাল উড়ছে। তাদের তীক্ষ্ণ চিৎকার শুনতে পেল ওরা। বাটন পাল খুলে বৈঠা হাতে নিল।

যত কাছিয়ে আসছে ডিকের উত্তেজনা ততই বাড়ছে। সী-গালগুলো নৌকার চারপাশে ডাকাডাকি করছে কর্কশ স্বরে। নৌকা ঢেউয়ের আঘাতে দুলছে। এমেলিন ভয়ে চোখ বন্ধ করল।

ঢেউয়ের গর্জন থেমে এলে ধীরে ধীরে চোখ মেলল এমেলিন।

তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে এক আশ্চর্য দেশ।

নৌকার দু'পাশে শান্ত নীল জলের মৃদু ঢেউ। পরিষ্কার জল। প্রবালের সারি দেখা যাচ্ছে অনেক নিচ পর্যন্ত। ঘুরে বেড়াচ্ছে অসংখ্য মাছ। তলার বালুরাশিতে স্পষ্ট ছায়া পড়েছে মাছের। বাটন বৈঠা থামিয়ে চেয়ে রইল এক ঝাঁক নীল পাখির দিকে। নিঃশব্দে ডানা মেলে উড়ে চলেছে দ্বীপের কোন উঁচু অংশের দিকে। সৈকতে ঝুঁকে আছে নারকেল গাছগুলো। সারিবদ্ধভাবে

দাঁড়িয়ে লেগুনের জলের ওপর নিজেদের ছায়া দেখছে যেন। এদের সাথে জড়াজড়ি করে আছে কাঁঠাল, কোকো-পাম, রুটিফলের গাছ। গুগাছলোর সাথে জড়িয়ে আছে বুনো আঙুরলতা। সমুদ্রের আলোর চোখ ঝলসানো প্রখরতা এই দ্বীপে নেই। একটা নরম আলো ছড়িয়ে আছে রঙ্গিন গাছ গাছালি, উড়ন্ত পাখি, সাদা প্রবাল-স্তূপ আর নীল লেগুনে। সব মিলিয়ে অন্তরকাড়া সৌন্দর্য–যা উদ্ধত, সুখী আর অনন্ত যৌবনের প্রতীক। এর মাঝে বাটন যখন ছোট্ট নৌকোটা বেয়ে আসছে পারের দিকে, ওদের একটু পেছনে জল থেকে ভেসে উঠল ত্রিকোণ একটা ছায়া। জলে ভুড়ভুড়ি কেটে শয়তান ছায়াটা আবার অদৃশ্য হয়ে গেল মুহূর্তে। ওরা তিনজন টেরই পেল না ব্যাপারটা। হাঁটু জলে নেমে ডিঙিটাকে টেনে তুলল বাটন সৈকত! তারপর এমেলিনকে কোলে নিয়ে নামল ডাঙায়। জল ভেঙে পাড়ে উঠে এল ডিক। মোহিত হয়ে পড়েছে সে। ডাঙায় নেমেই ছুটোছুটি শুরু করল সে। বাটন নৌকোটাকে ঠেলে তুলে দিল আরও শুকনো জায়গায়। এমেলিন তার জিনিসপত্র নিয়ে বালুতে বসে আছে। বাটনের কাজ দেখছে সে বড় বড় চোখ মেলে। চারদিকে অচেনা অদেখা দৃশ্য তাকে অবাক করে দিচ্ছে। এতকিছুর মাঝেও তার ছোট্ট মনটা বলছে কি যেন গোলমাল হয়ে গেছে। হঠাৎ তার স্মৃতিপটে ভেসে ওঠে নর্দামবারল্যান্ড জাহাজ, কুয়াশা, লেস্ট্রেঞ্জ কাক্কু, জাহাজ ছেড়ে সমুদ্রে ভাসা, সবশেষে এই নতুন দ্বীপ–ভাবতে ভাবতে ডিকের দিকে নজর পড়ল ওর। আঁতকে উঠল সে। চোখে আতঙ্ক। উঠে দাঁড়াল কাঁপতে কাঁপতে। তারপর একটানা ভয়ার্ত চিৎকার। ছুটে এল বাটন।

'ওরে খুদে শয়তান,' গর্জে ওঠে বাটন। 'ওকে ভয় দেখাচ্ছিস।'

ডিকের হাতে একটা জীবন্ত কাঁকড়া। ওটা হাতে নিয়ে ছুটে

আসছিল এমেলিনকে দেখাতে। এখনও দু'হাতে মুখ ঢেকে আছে এমেলিন।

'শয়তান কি, প্যাডি?' কাঁকড়া ফেলে দিয়ে শুধায় ডিক।

'শয়তান, শয়তান হলে তুমি। যাক, আমাকে আর বিরক্ত কোরো না। একটু আরাম করব এখন। বড্ড ধকল গেছে।' নিজের বিরাট শরীর নিয়ে একটা পাম গাছের নিচে বসল বাটন। পাইপে তামাক ভরে চকমকি জ্বালল। এমেলিন হামাগুড়ি দিয়ে বসল ওর কোল ঘেঁষে। এমেলিনের কাছাকাছি বালুর ওপর বসে পড়ল ডিক। বাটন কোট খুলে বালিশ তৈরি করল। একটা নারকেল গাছের গুঁড়িতে ওটা দিয়ে ঠেস দিল। দক্ষিণ সাগরের দ্বীপগুলোর অভিজ্ঞতা থেকে সে জানে, এই দ্বীপে যা খাদ্য মজুদ আছে তা একটা পুরো সেনাবাহিনীর রসদ। এখন দেখতে হবে পানীয় জল কোথায়। এখান থেকে সে দেখতে পাচ্ছে নিচু একটা অংশ। বর্ষাকালে ওটা হয়তো একটা ছোট্ট নদী হবে। লেগুনের মধ্যে এখুনি জল এসে পড়তে পারছে না। কিন্তু বনের ভিতর নিশ্চয়ই এর উৎস পাওয়া যাবে। অবশ্য এক সপ্তাহের পানীয় জল তাদের সঙ্গেই আছে। তাছাড়া এখানে রয়েছে ডাব। শুধু গাছে উঠে পেড়ে নেবার অপেক্ষা। পাইপে একটা সুখটান দিয়ে চোখ বুজল বাটন। এমেলিন খুলল তার রহস্যময় বাক্সটা।

'মাই গড! সেই বাক্সটা!' চোখ খুলতেই তড়াক করে উঠে বসল বাটন। 'তুমি ওটা এখানেও এনেছ?'

'খোলো দেখি,' ডিক বলল।

অত্যন্ত যত্নের সাথে বাক্সটা খুলল এমেলিন। বেরিয়ে এল ছোট ছোট চায়ের পট, কাপ, প্লেট, দুধের বাসন। প্রত্যেকটাতে নীল রঙের ফুল আঁকা।

'আরে! এটা দেখছি চায়ের সেট!' আমুদে গলায় বলল বাটন, 'চায়ের নেমন্তন্ন কখন দেবে, সোনামণি?'

'হবে এক সময়,' গম্ভীর মুখে বাক্সটা গোছাতে গোছাতে বলল এমেলিন।

'এবার থাকবার জন্য একটা ব্যবস্থা করা দরকার।' পাইপ টানা শেষ হতে উঠে দাঁড়াল বাটন। জুতোর হিলে তামাকের ছাই ঝাড়ল। 'আগে বনের ভেতরটা ঘুরে আসি আমি। পানির খোঁজ করতে হবে। বাক্সটা এই জিনিসপত্তরের সাথে রাখো। এখানে চুরি করার মত কেউ নেই।'

দুজনের হাত ধরে গাছ-পালার ভেতর দিয়ে চলতে শুরু করল বাটন। এ যেন এক পাইনের বন। লম্বা, ঋজু গাছগুলো যেন অঙ্কের নিয়মে পরস্পরের সাথে সমান দূরত্ব রেখে জন্মেছে। গাছের পাতার ফাঁক গলে ঝরে পড়ছে আলো।

'মি. বাটন,' চলতে চলতে এক সময় বলে এমেলিন, 'আমরা বনের মাঝে হারিয়ে যাব না তো?'

'হারিয়ে যাব? না, না। এই, হুঁশিয়ার!'

একটানে এমেলিনকে কাছে টেনে নিল বাটন। আধ হাত দূরে পড়ল জিনিসটা। খপ করে শব্দ হলো। চেয়ে দেখল এমেলিন। একটা ছোট্ট ডাব। বাটন ওটা তুলে নিল। 'চায়ের সাথে জমবে ভাল। চলো, চলো। হিস্!' কি যেন বলতে চাইছিল এমেলিন। চুপ করতে ইশারা করল ঠোঁটের কাছে তর্জনী তুলে। 'কথা বোলো না,' ফিসফিসিয়ে উঠল বাটন, 'ক্লারিকুন পিছু নেবে আবার।'

'ক্লারিকুন কি?' অস্ফুটে শুধাল ডিক।

'বুড়ো আঙুলের মাপের একটা পরী।'

'কি করে ওরা?'

'হিস্। কথা নয়। এমেলিন মাথা বাঁচিয়ে চলো। ওপরে উঠছি আমরা। গাছের ডালের ঝাপটা লাগবে তোমার।'

নারকেল গাছের বাগান ছেড়ে ওরা চলে এল গভীর বনে। আলো অনেক কম এখানে। বড় বড় পাতা মেলে গাছেরা ছায়াচ্ছন্ন

করে রেখেছে জায়গাটাকে। ঘনসন্নিবিষ্ট গাছগুলোকে সাপের মত জড়িয়ে আছে মোটা দড়ির মত বুনো আঙুরলতা। অগুণতি ফুলের সমারোহ জায়গাটার সৌন্দর্যে এক বিষণ্ন ভাব এনে দিয়েছে।

'চুপ!' বাটন হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে। কান খাড়া করে একটা শব্দ শুনতে চাইছে সে। বনের পোকামাকড়ের নানান ডাক। দূরে ডুবোপাহাড়ে সমুদ্রের ঢেউ আছড়ে পড়ার শব্দ। তার মাঝে হঠাৎ একটানা কল কল আওয়াজ একটা। পানির শব্দ! শব্দটার উৎস খুঁজতে এগিয়ে গেল ওরা। খানিক চলার পর সমতল একটা তৃণভূমিতে পৌঁছুল। ওপরে একটা পাহাড়। কালো পাথর ছিঁড়ে নেমে আসছে এক হাত চওড়া একটা জলস্রোত। তৃণভূমির আশেপাশে ফার্নের ঝাড়। একটা গাছ থেকে ঝুলছে কলমি ফুলের গুচ্ছ। মোহিত হয়ে পড়ল বাচ্চারা। দৌড়ে গিয়ে পানিতে হাত ডুবিয়ে দিল এমেলিন। ঝর্নার ঠিক পাশেই একটা কলাগাছ। বড় বড় কলাপাতার ফাঁকে কাঁচা সোনা রঙ কলাগুলো থরে থরে ঝুলছে। বাটন জুতো খুলে পাহাড়ে চড়তে শুরু করল।

'অ্যাই, সাবধান!' ওপর থেকে হুঁশিয়ারবাণী ভেসে এল। এক সেকেন্ড পরেই বিরাট একটা কলার কাঁদি পড়ল ডিকের পায়ের সামনে। ডিক চেঁচাতে লাগল আনন্দে।

এমেলিন চুপ। অন্য কিছু দেখতে পেয়েছে সে।

'মি. বাটন, দেখো, একটা ছোট্ট পিপে।' বাটন নিচে নেমে এলে বলল এমেলিন।

সেটাকে দেখল বাটন কপালের ঘাম মুছতে মুছতে। দুটো গাছের গুঁড়ির মাঝে আধপোঁতা শ্যাওলা ভরা জিনিসটার দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'একটা খালি পিপে। কোন জাহাজ এখানে জল ভরতে এসে ফেলে গেছে ভুলে। ওটা দিয়ে খাবার টেবিল বানাব আমরা।'

পিপের ওপর বসে এমেলিন ও ডিককে সদ্যপাড়া কলা ভাগ করে দিল সে। পিপেটা খালি না ভর্তি, তখনও জানতে না পারলেও ওটা একটা চমৎকার বসবার জায়গা সন্দেহ নেই।

'এখানে যদি আগে জাহাজ এসে থাকে, তবে আবার আসবে।' কলা খেতে খেতে বলল বাটন।

'বাপির জাহাজ আসবে?' ডিক শুধাল।

পকেট থেকে পাইপ বের করে বাটন বলল, 'নিশ্চয়ই আসবে। এখন, বাছারা, একটু খেলা করো। আমি তামাক খেয়ে পাহাড়ে চড়ে চারদিকটা দেখব।'

বনের গাছগাছালির ভেতর ছুটোছুটি শুরু করল ওরা। মোটা আঙুরলতায় দোল খাচ্ছে ডিক। এমেলিন এ-গাছ ও-গাছ থেকে ছোট্ট হাতে ফুল তুলছে অসংখ্য। ধূমপান শেষ করে বাটন ওদের ডাকল চেঁচিয়ে। ছুটতে ছুটতে এল ওরা। খুশিতে ডগমগ। এমেলিনের হাতে গুচ্ছের ফুল। ধূসর রঙের একটা বড় পাথরের মত জিনিস ডিকের হাতে। সে চিৎকার করে বলল, 'দেখো, প্যাডি, মজার একটা জিনিস পেয়েছি। মাঝখানে আবার গর্ত আছে!'

'ফেলে দাও।' বাটন চেঁচিয়ে উঠে দাঁড়াল। 'কোথায় পেয়েছ ওটা দেখি?'

জিনিসটা হাতে তুলে নিয়ে ভ্রূ কুঁচকে চেয়ে রইল। তার চোখে ঘৃণা আর আতঙ্ক। জিনিসটা ছাতাপড়া এক মড়ার খুলি। পেছন দিকটা তোবড়ানো। কুড়াল অথবা ধারাল অস্ত্রের আঘাত মনে হয়। ঘন বনের দিকে যদ্দূর জোরে পারল ছুঁড়ে দিল ওটাকে বাটন।

'ওটা কি, প্যাডি?' বাটনের আচরণে ডিক অবাক হয়েছে।

'ভাল জিনিস না।'

'আরও দুটো আছে ওখানে,' ডিক অস্ফুটে বলল।

'হায়, ঈশ্বর! খবরদার ওগুলো ধরবে না। মনে হয় খুনোখুনি

হয়েছিল একসময়, এমেলিন, তোমার হাতে কি?'

এমেলিন তার হাতের ফুলের গুচ্ছ বাটনের দিকে এগিয়ে দিল প্রশংসার প্রত্যাশায়। একটা বড় ফুল তুলে নিয়ে পকেটে রেখে দিল বাটন। তারপর ওদের নিয়ে পাহাড়ে উঠতে শুরু করল। যত উপরে উঠছে কমছে বনের ঘনত্ব। নারকেল গাছও এখানে কম। একটা বেতঝাড় পেরিয়ে এল ওরা। লম্বা লম্বা বেত জড়াজড়ি করে আছে। এরপর গাছপালাহীন একটা তৃণ-প্রান্তর। এখান থেকে উঠে গেছে একটা পাথর যার চূড়া এই দ্বীপের সবচেয়ে উঁচু জায়গা। কুড়ি ফুটের মত উঁচু। উঠে পড়ল ওরা হাঁচড়ে-পাচড়ে। এমেলিন রইল নিচে। চূড়াটা আকারে ডিনার টেবিলের সমান, সমতল। এখান থেকে দ্বীপ এবং সমুদ্র পরিষ্কার দেখা যায়। নিচের দিকে তাকাল। বাতাসে ঢেউ খেলানো গাছের মাথা দেখা যাচ্ছে। লেগুনের বিস্তৃত অংশ, ডুবোপাহাড়, তারপরই অনন্ত প্রশান্ত মহাসাগর। জল আর জল। ডুবোপাহাড় সমস্ত দ্বীপটা ঘিরে রেখেছে। সাগরের ঢেউ-ভাঙা গানের শব্দ ফিসফিসিয়ে ভেসে আসছে এখানে। দক্ষিণ পশ্চিমের বাতাস বইছে এখন। বাতাসের সাথে তাল মিলিয়ে দুলছে বট, কোকো, পাম, আরটু, রুটিফল গাছগুলো। এখান থেকে প্রবল বায়ুতাড়িত সমুদ্র, নীল লেগুন, ফেনায় ভরা ডুবোপাহাড়ের সারি, নাচের ভঙ্গিমায় গাছ-গাছালি–সমস্ত মিলিয়ে মনে হয় যেন কোন উৎসবের দিন। প্রকৃতি যেন আনন্দে মেতেছে। মাঝে মাঝে গাছগুলো থেকে বেরিয়ে আসছে রঙ-বেরঙের পাখি ঝাঁকে ঝাঁকে। উড়ে যাচ্ছে আকাশে। দূর থেকে সী-গালগুলোকে মনে হয় পানির ওপর ছোট ছোট ভাসমান সাদা মেঘ। লেগুনের রঙ কোথাও ঘন নীল কোথাও হালকা। গভীরতার জন্যই এমন দেখাচ্ছে। হালকা নীল অংশে প্রবাল-স্তূপের সারি। দ্বীপটা প্রায় মাইল তিনেক চওড়া। লোকবসতির চিহ্ন নেই কোন। সমুদ্রে অস্তিত্ব নেই কোন

জাহাজের। আশ্চর্য এক জায়গা। চারদিকে সবুজ আর নীলের বসতি। মানুষ নেই। সী-গাল আর বাতাস ছাড়া বাইরের জগতে খবর পৌঁছুনোর নেই কেউ।

বুড়ো নাবিক বাটন। বসে আছে চুড়োয়। তার দৃষ্টি স্থির। দক্ষিণ, দক্ষিণ-পশ্চিমের দূরদিগন্তে খুব ছোট্ট, অস্পষ্ট একটা বিন্দুর দিকে তাকিয়ে আছে সে। অন্য একটা দ্বীপের ইশারা পাচ্ছে সে। ওই অস্পষ্ট বিন্দুটি ছাড়া সমুদ্রে শুধু জল আর জল।

এমেলিন ওদের সাথে পাহাড়ের চুড়োয় ওঠেনি। একটা বিষাক্ত বৈঁচিফলের ঝোপের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। দুই গুচ্ছ ফল তুলে নিয়ে সে পাহাড়ের নিচে এসে দাঁড়াল। পাহাড় থেকে নামার সময় বাটন দেখতে পেল এমেলিনকে।

'খবরদার!' সে চেঁচিয়ে উঠে তাড়াতাড়ি নেমে এল। 'মুখে দিয়ো না। ওগুলো খেলে আর ঘুম ভাঙবে না কোনদিন।'

এমেলিনের কাছে এসে ওর মুঠি থেকে ফলগুলো কেড়ে নিল বাটন। ঝাঁকুনি দিল একটা এমেলিনকে বকা দেবার ভঙ্গিতে। পেছন ফিরে সাহায্য করল ডিককে পাহাড় থেকে নামতে। ফিরে চলল সৈকতে ওদের হাত ধরে।

সেই রাতে।

ওরা গল্প করছে। বাটনের তৈরি আশ্রয়স্থলে বসে। দুটো দাঁড়, গাছের একটা ডাল, নৌকার পাল দিয়ে তৈরি হয়েছে একটা তাঁবু। সামুদ্রিক বাতাস কখনও ক্ষিপ্ত হতে পারে অথবা উপর থেকে নারকেল পড়তে পারে। তাই, মজবুত করেই তৈরি করেছে যতটা সম্ভব। আকাশে তখনও চাঁদ দেখা দেয়নি। নক্ষত্রালোকিত বালুকাবেলায় বসে আছে ওরা।

'বনের মধ্যে দুপুর বেলা কাদের সম্পর্কে বলছিলে?' ডিকই নির্জনতা ভাঙল।

'কী ব্যাপারে?'

'ওই যে, কথা বলতে মানা করেছিলে না তখন?'

'ওহ্-হো। সেই খুদে ভাল মানুষদের কথা? ক্লারিকুনস্?'

'হ্যাঁ।' কৌতূহলী ডিক বলল, 'ভাল মানুষ বলতে কারা?'

'আমার দেশে পরীদের বলে ভাল মানুষ।'

'পরী বলে কিচ্ছু নেই,' ডিক প্রতিবাদ করল, 'মিসেস সিম্‌স্ বলতেন—ওরা নেই।'

'মিসেস হপকিন্স কিন্তু বলতেন—ওরা আছে,' বলল এমেলিন, পায়ের তলার মাটি নখ দিয়ে খুঁড়ছে।

'তোমরা ওদের মানো আর না মানো—ওরা আছে, অবশ্যই আছে। এখুনি হয়তো পিছনে বনের ভেতর থেকে আমাদেরকে উঁকি মেরে দেখছে, কথাবার্তা শুনছে,' হঠাৎ থেমে গেল বাটন। এমেলিনের মুখ সাদা কাগজের মত হয়ে গেছে, 'এখানে কিন্তু নেই। কিন্তু কনট গাঁয়ে থিক থিক করত। ঈশ্বরই জানে, কবে আবার গাঁয়ে ফিরে ওদের দেখব। তোমরা বিশ্বাস করো আর না করো, আমার বাবা একদিন দেখেছিল ওদের। মৌমাছির মত গুন্‌গুন্ করে কথা বলছে, হাতে হাত ধরে গোল হয়ে নাচছে। ওদের চোখে জোনাকি পোকার আলো। একটা পাথরে দাঁড়িয়ে আঙুলের একটা কড়ার সমান এইটুকুন মানুষ বাঁশি বাজাচ্ছে, আর ওরা গান গাইছে নাচতে নাচতে।' নিভে যাওয়া পাইপ ধরাবার জন্য বাটন চুপ করল। আকাশে চাঁদ। দূরে ডুবোপাহাড়। আছড়ে পড়ছে তাতে ঢেউ। ঢেউ ভাঙার শব্দ যেন ঘুম পাড়ানিয়া গান। জোয়ার আসার আগে লেগুনের জলে ঢেউ জাগছে মৃদু। দিনের আলোয় যেমনটা দেখাচ্ছিল, চাঁদের আলোয় অনেক বড় দেখাচ্ছে লেগুনকে। নীরব, সুনসান। মাঝে মাঝে ভেসে আসছে মাছেদের

ঘাই মারার শব্দ। চাঁদের আলোয় লেগুনটাকে সমুদ্রের একটা গুহা মনে হচ্ছে। লতা, ফুল, অর্কিড, গাছের শরীর–চাঁদের আলোয় যেন দীপ জ্বেলেছে। ওরা তিনজন। চুপচাপ। নীরব প্রকৃতির মত বসে আছে।

'শোবার সময় হয়েছে,' রাত বাড়তে বলল বাটন, 'এমেলিনকে বেঁধে রাখতে হবে,' পকেট থেকে লম্বা দড়ি বের করতে করতে বলল বাটন, 'ঘুমের মধ্যেও হাঁটে ও। হাঁটতে হাঁটতে বনের মধ্যে চলে যাবে আর ফিরতে পারবে না।'

'না-না, আমাকে বাঁধা চলবে না।' এমেলিন প্রতিবাদ করে উঠল।

'তোমার ভালর জন্যই বলছি, মামণি,' এমেলিনের কোমরে দড়ি জড়াতে জড়াতে বলল বাটন, 'এখন চলো।'

তাঁবুতে ফিরে দড়ির অপর প্রান্ত বাঁধল বৈঠার সাথে। বৈঠাটা তাঁবুর প্রধান খুঁটি।

'এখন যদি ঘুমের মধ্যে হাঁটা দাও তাহলে তাঁবুসুদ্ধ চাপা পড়ব,' বলে বাটন হাসল।

ঠিক তাই হলো রাতে।

'আমি ওই পুরানো প্যান্ট পরব না–পরব না, পরব না।'

উলঙ্গ ডিক বালুর উপর ছুটোছুটি করছে আর একটা প্যান্ট হাতে নিয়ে বাটন ছুটছে ওর পেছনে। যেন একটা কাঁকড়ার পেছনে ছুটছে একটা কৃষ্ণসাগরীয় হরিণ।

আজ পনেরো দিন ওরা এই দ্বীপে। এর মধ্যে ডিক আবিষ্কার করেছে তার জীবনের গভীরতম আনন্দ–নগ্ন হয়ে থাকার। উলঙ্গ হয়ে সে লেগুনের অগভীর জলে গড়াগড়ি খায়। রোদে শুকিয়ে নেয় দেহ। বসনের অভিশাপ থেকে সে মুক্তি চায়। জামা, কাপড়, জুতো, টুপির মত সভ্যতার বস্তুগুলোকে বাদ দিয়ে সে সাগর,

বাতাস আর সূর্যের সঙ্গী হতে চায়। দ্বীপে বাস করার দ্বিতীয় দিন থেকেই বাটন ওদের নগ্ন হয়ে স্নান করবার জন্য জোরাজুরি করেছিল। প্রথমে বাধা দিয়েছিল ডিক। এমেলিন, যাকে কাঁদতে দেখা যায় খুবই কম, বাটনের আদেশ শুনে সেমিজে মুখ লুকিয়ে কেঁদেছিল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। কি কষ্টই না হয়েছে জলে নামাতে। আর এখন জল থেকে ওদের তোলা এক সমস্যা। এই মুহূর্তে নগ্ন এমেলিন স্নান শেষে রোদ্দুরে শরীর শুকোচ্ছে, আর ডিকের পেছনে বাটনের জব্দ হওয়া দেখে খুশিতে হাততালি দিচ্ছে। ডিক ও এমেলিনের ডাঙার থেকেও আকর্ষণ বেশি লেগুনে। বনের পাকা কলা বেতের লাঠি দিয়ে খোঁচালেই পড়ে। সোনালী গিরগিটিগুলোর আচরণ সুন্দর। একটু সতর্কতা নিয়ে এগিয়ে গেলেই ওদের লেজ ধরে ফেলা যায়। পাহাড়ে উঠলে দ্বীপটা পরিষ্কার নজরে আসে। কিন্তু এদের মূল আকর্ষণ লেগুনের প্রতি।

জলের অনেক নিচে প্রবালের শাখা-প্রশাখা। বাটন যখন মাছ ধরে তখন প্রবাল-গুচ্ছের ফাঁকে ফাঁকে কত না খেলা চলে। সন্ন্যাসী কাঁকড়ারা তাড়িয়ে বেড়ায় রঙিন শামুকদের। সামুদ্রিক বায়ুপরাগিত এনোমোনেরা যেন বড় বড় গোলাপ। অনেক ফুল যাদের স্পর্শ করলে পাপড়ি বন্ধ করে দেয়। অদ্ভুত আকৃতির শঙ্খ তাদের খোলসে ভর দিয়ে হাঁটছে, পথ থেকে সরিয়ে দিচ্ছে কাঁকড়াদের, অথবা ভয় দেখাচ্ছে শামুকদের। ঝাঁক ঝাঁক রঙিন মাছ। অ্যালবিকোররা আগুনের মত চলে যায়। বাটন কখনও মাছ ধরবার জন্য বেশি দূরে যায় না। এটা অবশ্য তার আলসেমির সাথে খাপ খেয়ে যায়। প্রয়োজনীয় মাছ ধরা হয়ে গেলে পাড়ে চলে আসে। খড়কুটো জোগাড় করে চকমকি দিয়ে জ্বালে আগুন। সেই আগুনে ঝলসানো হয় মাছ, রুটিফল আর উদ্ভিদ টারো-র শিকড়। ডিক আর এমেলিন সাহায্য করে তাকে। তাঁবুটা তারা বনের ধারে গাছগাছালির মাঝে বেশ ভালভাবে দাঁড় করিয়েছিল।

যাতে থাকা-শোয়া আর বসার সুন্দর জায়গা থাকে। সারাদিনের কাজ-অকাজ, বিস্ময়, আনন্দের মাঝে দুটি শিশুই হিসেব হারিয়েছে সময়ের।

এখন আর লেস্ট্রেঞ্জের কথা মনেও নেই ওদের।

তিন

সময়ের মিথ্যে হিসেব-নিকেশ, বাস্তব জীবনের জটিলতা আর নিয়মের কঠিন বাঁধন থেকে যদি মুক্তি চান আপনি, তাহলে আপনাকে চলে যেতে হবে ছোট্ট একটি দ্বীপে। সেখানে থাকবে নির্জনতা। খোলা আকাশ। দিকচিহ্নহীন জল। উষ্ণ জলবায়ু। আপনার শরীর থাকবে উন্মুক্ত। মন দুশ্চিন্তাহীন। নিজেই সংগ্রহ করে নেবেন নিজের খাদ্য। বাকি কাজটুকু করবে প্রকৃতি সে যা করে বন্যদের জন্য। একসময় আপনি আবিষ্কার করবেন—বই, খবরের কাগজ, চিঠিপত্র, পাওনাদারের তাগিদ না থাকলেও সুখী হয়েছেন। আর বুঝতে পারবেন ঘুম নামক অপার্থিব বস্তুটির উপর প্রকৃতির কি ভূমিকা। এই দ্বীপে বাস করবার মাসখানেক পরে দেখতেই পাচ্ছেন ডিকের পরিবর্তন। এই সে প্রাণবন্যায় ভরপুর হয়ে বাটনকে সাহায্য করছে টারো শিকড় তুলতে, তারপরেই কুকুর কুণ্ডলী হয়ে ঘুমুচ্ছে এমেলিনের সাথে। গভীর ঘুমে দীর্ঘ সময় আচ্ছন্ন থেকে জেগে ওঠে ওরা নির্মল বাতাস, উজ্জ্বল আলো ঘিরে থাকা রঙিন পৃথিবীতে। দুটি শিশুর জন্য যেন প্রকৃতি খুলে দিয়েছে তার ভাণ্ডারের দরজা।

জাহাজ থেকে এমেলিন তার মহামূল্যবান বাক্সটি নিয়ে এসেছিল। আর ডিক এনেছিল অনেকগুলো মার্বেল। একটা বড় মার্বেল আছে ওগুলোর সাথে। দ্বীপের বালুকাবেলায় মার্বেল খেলছে ডিক, এমেলিন। এগিয়ে এল কৌতূহলী বাটন। প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে ওদের খেলার সমালোচনা করছিল এতক্ষণ। এখন সে নিজেই জড়িয়ে পড়ল সোৎসাহে। হাঁটু মুড়ে তার বড় বড় মোটা আঙুল নিয়ে মত্ত হয়ে গেল এই খেলায়।

'মাদাম, চা আপনার পছন্দ হয়েছে তো?' খেলা শেষ হতে 'টি পার্টি' দিয়েছে বাটন। বিদেশ বিভুঁই, টি-সেট নেই তাই ধার নিয়েছে মিস এমেলিনের টি-সেটটা। এখন সে পরিবেশন করছে চা।

'দয়া করে আর এক টুকরো চিনি দিন, মি. বাটন,' এমেলিন তার কাপে ঠোঁট ডুবিয়ে বলল। পার্টি শেষ হলে এমেলিন কাল্পনিক জলে তার চায়ের কাপ ধুয়ে মুছে তুলে রাখল বাক্সে।

'প্যাডি, জীবনে তোমার নাম দেখেছ?' এবার ডিক প্রশ্ন করল বাটনকে।

'আমার নাম?' আশ্চর্য হয়ে বাটন বলল, 'দেখা যায়? ধুস্—কি যে বলো তুমি?'

'দাঁড়াও, দেখাচ্ছি তোমার নাম!' ডিক এক টুকরো কাঠ এনে সাদা বালুর ওপর আঁচড় কাটল কয়েকটা।

'বাহ্, তুমি খুব পণ্ডিত ছেলে দেখছি।' একটা নারকেল গাছে ঠেস দিয়ে বসে সপ্রশংস দৃষ্টিতে চেয়ে বলল বাটন।

আর পায় কে, ছুটে এল ডিক। 'তোমাকে লেখা শেখাব।' বাটনকে নিজের নাম লেখাতে শেখাবার জন্য উঠে পড়ে লাগল সে। কয়েকদিন কঠোর পরিশ্রম করে শিখে ফেলল বাটন নিজের নাম লেখার কায়দাটা। খুশিতে আত্মহারা হয়ে প্রায় লাফাতে শুরু করেছে সে এখন। নিজের পুরানো টুপিটা লেখা নামের ওপর

AMARBOI.COM

নাড়তে নাড়তে নিজেকেই সংবর্ধনা জানাচ্ছে। দূরে সী-গালেরা হি-হি-হি শব্দ করে যেন প্রশংসা করল বাটনের।

একদিন এমেলিনের শখ হলো সে বাটনকে ভূগোল শেখাবে।

'মি. বাটন, তুমি আমার কাছে ভূগোল শিখবে?'

'ভূগোলটা আবার কি?'

'যেখানে দেশের খবর থাকে।'

'ওটা শিখে কি লাভ হবে আমার?'

'দুনিয়াটাকে জানতে পারবে!'

'না, সোনা, ওসব কেতাবের কথা শুনলে মাথা ঘুরে যায় বোঁ করে।'

এভাবে দিন যাচ্ছে। এই সময়ের মধ্যে কোনো জাহাজের মাস্তুল পর্যন্ত দেখা যায়নি। কিন্তু তাতে বাটনের মনে কোন কষ্ট নেই। ডিক আর এমেলিন তো সব ভুলেছে।

বর্ষাকাল এসে গেল। বর্ষাকালের রূপ এখানে সম্পূর্ণ আলাদা। অঝোর বর্ষণের পরেই আকাশভরা সূর্যের সাতরঙা রামধনু। বাতাসে ভেসে বেড়ায় নতুন অঙ্কুরিত উদ্ভিদের আকুল করা গন্ধ। এক বর্ষার পর বাটনের মাথায় এল একটা বাঁশের ঘর তৈরি করতে হবে। কিন্তু ভাবনা পর্যন্তই। একটা কোকো পামের গায়ে ঠেস দিয়ে বসে পাইপ টানছে সে ভাবতে ভাবতে। ডিকের সাহায্য ছাড়া ঘর বানানো অসম্ভব। মুক্ত পরিবেশ ছেড়ে ঘরের মধ্যে বাস করায় ডিকের অমত থাকলেও তার আগ্রহ জেগে উঠল বাড়িটা বানানোয় সাহায্য করতে। কিন্তু বাটন তারিখ পিছাতে থাকে নানা অজুহাতে। পেরেক যদি না পায় তবে বাঁশ ও বেতের জোড়াগুলো বাঁধবে কি দিয়ে? সে পাইপ টানতে টানতে সার, ডিকের শয়তানি বুদ্ধি সমাধান দিয়ে দেয় সব এক এক করে। গাছে ঠেস দিয়ে পাইপ টানতে টানতে আরও সমস্যার কথা বলতে থাকে বাটন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ডিকের তাগাদায় তাকে বাড়ি তৈরির মাল-মশলা

জোগাড় করতেই হলো। সমান তালে ডিক খাটছে তার সঙ্গে। ডিকের বিশ্রাম নেই, পাইপ টানাও নেই। পরী আর ক্লারিকুনদের গল্প ফেঁদেও লাভ হয়নি কোন। দুজনের মিলিত পরিশ্রমে শেষ পর্যন্ত পনেরো দিনের মাথায় তৈরি হলো বাঁশের বাড়িটা। বনের ধার ঘেঁষে এই বাড়িটার আকৃতি দাঁড়িয়েছে উত্তর আমেরিকার রেড ইন্ডিয়ানদের কুটিরের মত। ইতোমধ্যে মাছ মারার জন্য ডিক কোঁচ বানিয়ে নিয়েছে। ডিঙি বেয়ে ওরা ভাটা পড়া ডুবোপাহাড়ের জলে আটকে থাকা অজস্র মাছ শিকার করে।

অন্য একদিন।

ডিক বলল, 'আলু চাষ করব, প্যাডি।'

'আলু কিভাবে চাষ করতে হয় জানো তুমি?' গম্ভীরমুখে জিজ্ঞেস করল বাটন। মনে মনে অলস বুড়ো প্রমাদ গুণছে।

'তুমি বলো।' শুধাল ডিক প্রচণ্ড আগ্রহ নিয়ে।

উল্টো-পাল্টা খুব বোঝাল বাটন।

'এখানে আলু চাষ করা যাবে না।' শেষ পর্যন্ত ফতোয়া জারি করল সে।

'কারণ?'

'মাটি কোপাবার কোদাল নেই। তাঁবু থেকে অনেক দূরে ভাল মাটি, কাজেই–'

মাঠি কোপাবার বিকল্প সম্পর্কে বলে দিল ডিক বাটনকে।

'শয়তান আছে তোমার মাথায়,' মনে মনে বলল বাটন। বাইরে দেঁতো হাসি হেসে বলল, 'তুমি আর এমেলিন আলুর চাষ করোগে যাও।'

কাছে বসে এমেলিন একগুচ্ছ লায়ানা ফুল নিয়ে মালা গাঁথছে। মাসের পর মাস সূর্যের আলো আর বাতাসের স্নিগ্ধতা অনেক পরিবর্তন এনে দিয়েছে এই মেয়েটির। তার স্বপ্নালু চোখের দৃষ্টি

AMARBOI.COM

এখন বাস্তবতায় পূর্ণ। সেদিনের সেই তাঁবু চাপা পড়ার পর ঘুমের মধ্যে হাঁটা রোগ চলে গেছে চিরতরে। মুক্ত বাতাস, সমুদ্র স্নান এনে দিয়েছে সুন্দর স্বাস্থ্য। এমেলিনের গায়ের রঙ জিপসি মেয়েদের মত রোদে পোড়া ধূসর। লম্বায় খুব একটা বাড়েনি সে। কিন্তু পরিপুষ্ট গোলগাল হয়েছে শরীর।

কয়েক মাসের আধ-বুনো জীবন ডিকেরও আকৃতির অনেক পরিবর্তন ঘটিয়েছে। লম্বা হয়েছে ইঞ্চি দু'য়েক। রোদে পোড়া শরীর আর ফুটকি ফুটকি দাগ নিয়ে ওকে দেখায় বারো বছরের ছেলের মত। ওর দেহ যেন পরিণত মানুষের প্রতিশ্রুতি বহন করছে। ডিক দেখতে ভাল না হলেও তার স্বাস্থ্য দেখার মত। প্রাণখোলা হাসিতে ভরে থাকে তার মুখ। মুখে দুঃসাহস আর ঔদ্ধত্যের ছায়া।

বুড়ো নাবিকের কাছে ওদের পোশাক একটা সমস্যা। দ্বীপের আবহাওয়ায় পোশাক অপ্রয়োজনীয়। কিন্তু বাটন ওদের নগ্ন থাকতে দেয় না। কিছু কাপড় পেয়েছিল সে কোনান ডোয়া জাহাজে। কাঁচি আর সুঁইসুতো দিয়ে একটা ঘাঘরা বানিয়েছে সে এমেলিনের জন্য। ডিক নিজেই তার নগ্নতা ঢাকবার ব্যবস্থা করে নিয়েছে। নারকেল গাছের মাথায় যে পাতার আস্তর থাকে–তারই এক টুকরো দিয়ে বানিয়েছে দুই জঙ্ঘার মধ্যবর্তী জায়গার আবরণ।

আজ সকালে দেখা গেল চিৎকার করতে করতে পাহাড়ের চূড়া থেকে নেমে আসছে ডিক। মাছ ধরবার সরঞ্জাম নিয়ে ব্যস্ত ছিল বাটন। সে দেখতে পেল বন পেরিয়ে বালুর ওপর দিয়ে ছুটে আসছে ডিক।

'প্যাডি–একটা জাহাজ!'

পাহাড়ের মাথায় উঠতে বেশিক্ষণ সময় নিল না বাটন।

সত্যিই দ্বীপে ঢুকছে একটা জাহাজ। মজবুত ইঞ্জিন চালিত নৌকা, মাস্তুলে 'কাকের বাসা'—সব মিলিয়ে কোন সন্দেহ নেই এটা একটা তিমি শিকারী জাহাজ। এইসব তিমি শিকারী জাহাজ সম্পর্কে প্রচুর অভিজ্ঞতা আছে বাটনের। 'শয়তানদের জাহাজ,' গাল দিল বাটন।

একটা বট গাছের আড়ালে ডিক আর এমেলিনকে লুকিয়ে ফেলল সে। বলল, 'যতক্ষণ আমি ফিরে না আসছি একদম নড়াচড়া করবে না। এই জাহাজের লোকগুলো দেখতে পেলে জ্যান্ত ছাল ছাড়িয়ে নেবে।' বলেই ছুটে এল তাদের বাঁশের কুটিরে। ওখানে যত জিনিস ছিল ডিঙিতে তুলে নিল সব। সময় ছিল না, নইলে বাড়িটাকে ভেঙে দিয়ে যেত। তারপর ডিঙি চালিয়ে লেগুনের অন্য প্রান্তে এসে জল থেকে জেগে ওঠা একটা আওরা গাছের নিচে দাঁড়াল সে খানিকক্ষণ। সেখান থেকে হেঁটে নারকেল গাছের কুঞ্জের আড়ালে গিয়ে দেখতে লাগল জাহাজটাকে।

ডুবোপাহাড়ের খাঁড়ির মাঝ দিয়ে বাতাস বইছে প্রচণ্ড। কিন্তু অবলীলায় ঢুকে পড়ল জাহাজটা লেগুনে। জাহাজের সামনে পথপ্রদর্শকও নেই। নেই জল মাপবার লোক। কিন্তু খাঁড়ি পার হলো এমনভাবে যেন কত পরিচিত জায়গা। অবশ্য এই তিমি শিকারী জাহাজগুলো প্রশান্ত মহাসাগরের প্রতিটি কোণ, প্রতিটি গর্তের নাড়িনক্ষত্র জানে।

নোঙর পড়ল জাহাজের। আর অপেক্ষা করল না বাটন। জঙ্গলের গভীরে চলে গেল ডিক আর এমেলিনকে নিয়ে। ওখানেই কাটাল রাতটা।

পরদিন সকালে জাহাজটিকে দেখা গেল না আর। তার বদলে বালুকাবেলায় পড়ে ছিল অসংখ্য পদচিহ্ন, খালি বোতল আর আধখানা পুরানো খবরের কাগজ। ওদের বাঁশের কুটিরটা পড়ে

আছে টুকরো টুকরো হয়ে।

বাটন সমুদ্রের দিকে মুখ করে জাহাজটা আর তার শয়তান নাবিকদের উদ্দেশে গালাগালি দিল খানিকক্ষণ। শয়তানগুলো কাজ বাড়িয়ে দিয়েছে তার। কুটিরটা তৈরি করতে হবে আবার। প্রতিদিন দুপুরে পাহাড়ে ওঠা এখন বাটনের রুটিন। দেখে তিমি শিকারী জাহাজ আসছে কিনা। তার স্বপ্নের মধ্যেও হানা দেয় তিমি শিকারী। দীর্ঘকাল জাহাজের খোলে বাস করে অসহ্য হয়ে উঠেছিল সে। এই দ্বীপের মন্থর জীবন পছন্দ হয়ে গেছে ওর। তিমি শিকারী না হয়ে রাজকীয় ডাকবাহী জাহাজ এলেও দ্বীপ ছাড়বার ইচ্ছে নেই বিন্দুমাত্র। যা তামাক আছে, বহুদিন চলে যাবে তার। আছে খেলার সাথী দুটো বাচ্চা। হাত বাড়ালেই অফুরন্ত খাদ্য সম্ভার। আর কি? একটা শুঁড়িখানা যদি খুলে দিতেন প্রকৃতি-দেবী। আহ্! ভাবে বাটন।

তিমি শিকারীদের আচমকা আক্রমণে শুধু কুটিরটারই ক্ষতি হয়েছে তা নয়; আসল ক্ষতি হয়েছে এমেলিনের। মহামূল্যবান সেই বাক্সটা আর পাওয়া যাচ্ছে না। চারদিকে খোঁজ চালাল বাটন ক'দিন। শুকিয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে এমেলিনের মুখ। ডিকও পাল্লা দিয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে বাটনের সাথে। শুধু এক কোণে নিথর বসে থাকে এমেলিন। নাহ্, পাওয়া গেল না ওটা। এক হপ্তা ধরে পড়ে রইল এমেলিন দুঃখের সাগরে। মালা গাঁথার শখ ছিল এমেলিনের। বিচিত্র বর্ণের প্রিয় ফুলগুলো নিয়ে ভুলতে চেষ্টা করল দুঃখ। একদিন সকালে বাটনের পাশে বসে ঝিনুকের মালা গাঁথছে, দেখা গেল বনের প্রান্ত ধরে ছুটে আসছে ডিক। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ল ছুটতে ছুটতে। কিছু খুঁজল। মাথা হেঁট করে কুড়িয়ে নিল একটা কচ্ছপের খোল। ছুটে গেল ফের বনের ভেতর। 'প্যাডি, একটা মজার জিনিস পেয়েছি।' ওখান থেকেই ভেসে এল চিৎকারটা। খুব সাবধানে পা টিপে টিপে বেরিয়ে এল ডিক বনের

ভেতর থেকে খানিকক্ষণ পরেই। কি যেন আছে কচ্ছপের খোলটায়।

'প্যাডি, আমি সেই পুরানো পিপেটা উল্টে দিয়েছি। ওর মুখটা খুব শক্ত ছিপি দিয়ে মোড়া।' কাছে এসে ডিক বলল, 'আমি ছিপিটা অনেক কষ্টে খুললাম। মাগো, কী বিশ্রী গন্ধ! এই যে–' ডিক কচ্ছপের খোলটা তুলে দিল বাটনের হাতে।

খোলের ভেতর হলুদ বর্ণের তরল পদার্থ! গন্ধ শুঁকল বাটন। চকচক করে উঠল চোখ দুটো। জিভ ঠেকাল। 'মাই গড!' লাফিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল বাটন। তার চোখে-মুখে খুশি উপচে পড়ছে, 'এ-যে রাম!'

'রাম কি, প্যাডি?' এমেলিন শুঁধাল।

'কোথায় পেয়েছ, সোনা, এ জিনিস?' এমেলিনের কথায় কান না দিয়ে ডিককে শুধাল বাটন।

'পুরানো পিপেয়!'

'মাই গড!' খুশিতে পারলে লাফায় বাটন।

'হ্যাঁ। ছিপিটা খুলতেই–'

'আবার বন্ধ করে দিয়েছ তো ছিপিটা? আহা, ঈশ্বরের কি দয়া। দিনের পর দিন ওই পিপেটার ওপর বসেছি আমি। এক ফোঁটা মদের জন্যে শুকিয়ে গেছে আমার জিভ। আর ওটার মধ্যে কিনা রাম!'

এক চুমুকে খোলটা খালি করে ফেলল বাটন। ঠোঁট চেপে রইল যাতে একটু ফেনাও বের হতে না পারে। তারপর এমেলিনের দিকে তাকিয়ে বন্ধ করল একটা চোখ। হেসে উঠল এমেলিন। তারপরেই ছুটল বনের দিকে। পেছনে ওরা দুজন। সত্যিই মাটির তলা থেকে উঠে এসেছে পিপেটা ডিকের অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের ফলে। তিমি শিকারী শয়তানগুলো জল ভরতে এসে এটাকে যে দেখতে পায়নি রক্ষা, ভাবল বাটন। কচ্ছপের খোলটা

AMARBOI.COM

দিয়ে পিপের গায়ে ঠুকল। ভর্তি পিপে। কি করে এল, কে এটাকে ফেলে গেছে কে বলবে? সেই মড়ার খুলিটা যদি কথা বলতে পারত, হয়তো জানা যেত। আর একবার স্বাদ নিল বাটন। এক চুমুক খেতে দিল ডিককে। থু থু করে মুখ থেকে ফেলে দিল তরল পদার্থটা। তারপর ওরা দুজন গড়িয়ে নিয়ে চলল পিপেটাকে। ফুলের মালা গলায় দিয়ে এমেলিন চলল সামনে।

দুপুরের খাওয়া শেষ হলে বাটন কচ্ছপের খোলটায় ভর্তি করে নিল রাম। পাইপ ধরাল গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে। কলাপাতা মোড়া মাছ সিদ্ধ, টারোর শিকড় আর ডাব দিয়ে খাওয়া জমেছিল ভাল। পিপের রাম খুবই ভাল জাতের। বহুদিনের পুরানো হওয়ায় চমৎকার হয়ে আছে। সানফ্রান্সিসকোর অলি-গলিতে যে ভয়ঙ্কর তরল পদার্থ পাওয়া যায় অথবা বন্দরের শুঁড়িখানায় যে মাল দেওয়া হয়, তার তুলনায় এ অমৃত। রাম-এর প্রভাবে বাটন হয়ে উঠেছে ফুর্তিবাজ। ডিক আর এমেলিন বুঝতে পারছে কোন মজার ব্যাপার ঘটে গেছে তাদের বন্ধুর। সাধারণত দুপুরের খাবার পর বাটনকে ঝিমুতে দেখা যেত। আজ সে অনেক গল্প বলছে। শেষে শুরু করল গান। অমান তালে ধুয়া ধরল ডিক আর এমেলিন, গানের মাথা-মুণ্ডু না বুঝেই। গাছের উপর বড় বড় উজ্জ্বল চোখ নিয়ে এই সুখী পিকনিক পার্টির দিকে তাকিয়ে থাকে পাখিরা। বাটনের গলা প্রতিধ্বনি তোলে। বাতাস তা বয়ে নিয়ে যায় ডুবোপাহাড়ের উপর সী-গালদের কাছে। সী-গালেরা বোধ হয় বাটনের সাথে সহযোগিতা করার জন্যেই ঘুরে ঘুরে কর্কশ চিৎকার করতে থাকে। সন্ধেবেলা বাচ্চারা ঘুমিয়ে পড়লে পিপেটা গড়িয়ে জলের ধারে নিয়ে গেল বাটন। তার ইচ্ছে নয় যে বাচ্চারা তার মাতাল হওয়া দেখুক। অনেক রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল এমেলিনের। অদ্ভুত করুণ সুরে গান গাইছে বাটন। সকালে ঘুম

ভাঙলে বাটন দেখল পিপের পাশে পড়ে আছে সে। তাজা, ঝরঝরে লাগছে শরীর। ডিককে রান্নায় লাগিয়ে নারকেল গাছের ছায়ায় একটা কোটকে বালিশ করে পুরানো দিনের কথা বলতে লাগল শুয়ে শুয়ে। আরাম করে পাইপ টানা তো আছেই।

সেই রাত আর পরবর্তী একটি হপ্তা গান গেয়েই কাটল বাটনের। উল্টো-পাল্টা, উঁচু এবং দ্রুত লয়ে গান গাইছে সে। তাই দেখে বাচ্চারা মহাখুশি। খিদে চলে গেল কিছুদিন পর। ঘুমও গেল উড়ে। একদিন সকালে ঘুম থেকে জেগে ডিক দেখতে পেল বাটন বালুর ওপর কোন জিনিসের দিকে স্থির এবং অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। দৌড়ে গেল ওরা তার কাছে। বাটন তখন তার ডানহাত এমন ভাবে উঁচু করে আছে যেন খপ্ করে কিছু ধরবে। হঠাৎ বালুর ওপর হাতটা আছড়ে ফেলে মুঠো করল আঙুল। তারপর মুঠো খুলে দেখতে লাগল।

'কি ধরছ, প্যাডি?'

'ক্লারিকুন।' বাটন জবাব দিল, 'সবুজ পোশাক পরা সব–' খিল খিল করে হেসে উঠল এমেলিন। বাটনও হাসল বোকার মত। বলল, 'ধুস্, ক্লারিকুন-ফ্লারিকুন কিচ্ছু নয়। রাম মাথা শেষ করে দিয়েছে–আরে! সর্বনাশ।' চোখ গোল হয়ে গেল বাটনের, 'বালুর ভেতর থেকে কত লাল ইঁদুর উঠে আসছে!'

হাতে আর পায়ে ভর করে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে বাটন নারকেল গাছগুলোর দিকে। তার চোখে বিভ্রান্তির দৃষ্টি। এক সময় মনে হলো সে বাতাসে উড়বার চেষ্টা করছে। বাটনকে ঘিরে হাসতে-হাসতে নাচতে লাগল ডিক আর এমেলিন। মজার খেলা পেয়েছে ওরা।

'প্যাডি! ইঁদুর-ইঁদুর।' ডিক নাচতে নাচতে বলল।

'আমার সামনে এসে গেছে ওগুলো।' থাবলা দিয়ে একটা কাল্পনিক ইঁদুরের লেজ ধরার চেষ্টা করল বাটন, 'গেল, গেল

বেজন্মাগুলো, পালিয়ে গেল যাহ–' তারপর হঠাৎ চোখ কচলে নিয়ে বলল, 'হায় ঈশ্বর! এ আমি কি করছি? বোকা বানাচ্ছি কেন নিজেকে?'

'চালিয়ে যাও, প্যাডি–চালিয়ে যাও,' চেঁচিয়ে ডিক বলল, 'থেমো না, প্যাডি,' খুশিতে হাততালি দিচ্ছে এমেলিন, 'ওই দেখো, আরও কত ইঁদুর তোমার পেছনে পেছনে আসছে।'

'শাট্ আপ্!' বালুতে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বাটন বলল, 'ওরা চলে গেছে।'

খেলা ভঙ্গ হওয়াতে মন খারাপ করে ডিক আর এমেলিন গোমড়া মুখে দাঁড়িয়ে থাকল। নতুন খেলার জন্য অপেক্ষা করছে ওরা। লেগুন থেকে হঠাৎ ঘোড়ার মত জলজ একটা প্রাণী ডাঙ্গায় উঠল লাফিয়ে। বাটন ছুটতে শুরু করল দৃশ্যটা দেখেই।

'ডিক, ডিক!' চিৎকার করছে সে, 'ওকে তাড়াও, ওকে তাড়াও। দেখছ না ঘোড়াটা আমাকে তাড়া করছে। ধরতে পারলে ঘাড়ে চড়ে মারবে–'

'কি মজা, কি মজা!' বাটনের পিছু ছুটতে ছুটতে ডিক বলে। ছুটতে ছুটতে এক সময় বালুর ওপর বসে হাঁপাতে থাকে বাটন। বলে, 'থাক এখন বেশ আছি। এরপর কেউ যদি তাড়া করে তবে সমুদ্দুরে ঝাঁপ দেব, বলে রাখলাম।'

ছেলেরা চলে যেতে ঘুমিয়ে পড়ল বাটন। একটানা ছ'ঘণ্টা। ঘুম ভাঙতে খানিকটা সুস্থ বোধ করল সে। কিন্তু মন দ্বিধাগ্রস্ত, আচ্ছন্ন। ফের ঘুমিয়ে পড়ল সে।

সোনার সকাল।

ঘুম ভাঙল বাটনের। তাজা, ঝরঝরে লাগছে তার। চোখের সামনে ভীতিজনক কিছু আর নেই। লেগুনের পাড় ধরে ঘুরে বেড়াল সে। পুব-দিগন্তে সোনা রঙ। ডুবোপাহাড়ের খাঁড়ির ফাঁকে

ঝিলিক মারছে সূর্য। সেদিকে তাকিয়ে অনুশোচনায় ভরে গেল তার মন। খিস্তি করল সে খানিকক্ষণ মদ জাতীয় সব জিনিসকে। প্রতিজ্ঞা করল জীবনে আর মদ ছোঁবে না। পিপের পদার্থটাকে লেগুনের জলে বিসর্জন দিতে সায় দিল না তার মন। ডিঙ্গিতে পিপেটা তুলে নিয়ে ডুবোপাহাড়ের কাছে বড় একটা প্রবাল স্তূপের নিচে রেখে দিল ওটাকে।

পরবর্তী ছ'মাস তাকাল না ওদিকে। ইতোমধ্যে আর একটা তিমি শিকারী জাহাজ জল ভরতে এসে তছনছ করে গেছে দ্বীপটাকে। ওরা তখন গভীর জঙ্গলে ছিল। এরপর থেকেই পিপেটা আবার জ্বালাতন শুরু করল ওকে। ছোট দিন লম্বা হলো প্রকৃতির পরিবর্তনে। লম্বা দিনগুলো বড় ক্লান্তিকর। ডিক আর এমেলিনের অবশ্য এতে কোন কষ্ট নেই। আরও বেশি সময় পেয়ে প্রাণ প্রাচুর্য আর স্বাস্থ্যে ভরপুর এই দু'জনের সুখ ও আনন্দ বেড়ে গেছে। কিন্তু দিনগুলো ভিন্ন রূপ নিয়ে এল বাটনের জন্য। লুকোনো পিপেটা খালি ফিসফিস করে কানের কাছে। নিজেকে ব্যস্ত রাখার জন্য এমেলিনকে একটা পোশাক বানিয়ে দিল সে। কাঁচি দিয়ে চুল ছেঁটে দিল ডিকের। রাতে, রামের লোভ তাড়াবার জন্য গল্প শোনাতে শুরু করল। গল্পটা জ্যাক ডগার্থি আর জলপরীদের নিয়ে। জলপরীরা জ্যাককে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যায় জলের তলায় ওদের দেশে। নানারকম সুস্বাদু খাদ্যের ভোজ হবার পর জ্যাককে দেওয়া হলো একটা বোতল–বোতলটা রামের। বাচ্চারা ঘুমিয়ে পড়ল গল্প শুনতে শুনতে। জেগে থাকল বাটন। ওই গল্পটাই তাড়া করল বাটনকে। ডিঙি নিয়ে ভেসে পড়ল সে। খানিকক্ষণ পর দেখা গেল চাঁদের আলোয় ভরা একটা পাথরে বসে আছে ঠেস দিয়ে। বাঁ হাতে জ্বলন্ত পাইপ ডান হাতে কচ্ছপের খোল। লেগুনের এই পাড়ে বাতাস বয়ে আনে বাটনের সুখী কণ্ঠস্বর। মন খুলে গাইছে সে। এক সময় উঠে দাঁড়াল। নৌকা

বেয়ে ফিরে এল আওয়া গাছের নিচে। বাচ্চাদের যাতে ঘুম না ভাঙে তার জন্য যথেষ্ট সাবধান হলো সে। নৌকাটাকে বাঁধল গাছে। জুতো, কোট খুলল। ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে। সাঁতার কেটে এগিয়ে গেল পাহাড়টার কাছে। রাত্রির নিস্তব্ধতা ভাঙছে কে–দেখবার জন্যে জলে ভেসে উঠল একটা ত্রিকোণ ছায়া। ডুবে গেল ফের টুপ করে। ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত বাটন পাথরের গা বেয়ে উঠে এগিয়ে গেল পিপেটার দিকে হামাগুড়ি দিয়ে। পিপেটার গায়ে হাত দিতেই ভুলে গেল সে কি করতে হবে তাকে। ক্লান্তি আর অবসাদে ওটাকে জড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়ল সে।

'গেল কোথায়, প্যাডি?'

সকাল হয়েছে। প্যাডি নেই কোথাও। খাবার জোগাড়ে নিজেই লেগে গেল ডিক। আগুন জ্বালাবার জন্য শুকনো ডালে পা দিয়ে ভাঙতে ভাঙতে ডিক বিড় বিড় করছে, 'বালুতে ওর কোট, জুতো, দিয়াশলাই সব পড়ে আছে। গেল কোথায়?'

কাছে বসে ডিকের কাজ দেখছিল এমেলিন। দু'জন ঈশ্বর তার এই জগতে। প্যাডি বাটন আর ডিক। বাটন হলো পাইপের রহস্যময় ধোঁয়ায় মোড়া দুর্বোধ্য ঈশ্বর। আর ডিক, সাথী কিন্তু রক্ষাকর্তা হিসেবে প্রশংসনীয়। দ্বীপে এই আড়াই বছর লম্বায় কিছুটা বেড়েছে সে। দেহ হয়েছে শক্তিশালী। বাটনের মত নৌকা বাইতে পারে, জানে আগুন জ্বালতে। গত কয়েকটা মাস বলতে গেলে বাটন রাম-এর পাত্র হাতে নিয়ে শুয়ে-বসে-ঘুমিয়ে কাটিয়েছে। রান্না-বান্না, মাছ ধরা, ফলমূল সংগ্রহ প্রায় সবটাই করেছে ডিক।

'এম, এদিকে এসো। দিয়াশলাইর বাক্সটা দাও,' ভাঙা কাঠকুটো জড়ো করতে করতে হাঁক দিল ডিক। আগুন ধরিয়ে বসে গেল রুটিফল সেঁকতে। এমেলিনও বসে নেই। বেতের

AMARBOI.COM

ছড়িতে গেঁথে নিল মাছ। আগুনে ধরে সেঁকতে লাগল। এক একদিন এমেলিনের হাতের মাছগুলো পুড়ে কয়লা হয়ে যায়। ডিক লাগায় ধমক। তখন পাকা রাঁধুনির মত কাজ করতে মন দেয় সে। অপূর্ব দেখায় তাকে। আগুনের উত্তাপে ঠোঁট কোঁচকায়।

'প্যাডি,' কাজ করতে করতেই বাটনকে ডাক দেয় ডিক। নারকেল গাছগুলো থেকে প্রতিধ্বনি ফিরে আসে শুধু। বাটনের কোন সাড়া পাওয়া গেল না। 'ওর জন্য অপেক্ষা করে লাভ নেই। রাতে মাছ ধরবার জন্য লেগুনে বড়শি ফেলে ওখানেই ঘুমিয়ে পড়েছে নিশ্চয়ই।'

'প্যাডি! কোথায় তুমি?'

খেতে খেতে এবং খাওয়া শেষ করে বেশ ক'বার চেঁচাল ডিক। কান পেতে রইল দুজন, যদি বাটনের সাড়া পাওয়া যায়। একটা পাখি উড়ে গেল। দৌড়ে গেল একটা গিরগিটি। শব্দ ভেসে এল ঢেউয়ের, আছড়ে পড়ছে ডুবোপাহাড়ে। কিন্তু বাটনের কোন সাড়া নেই। শেষে আওয়া গাছটার কাছে দৌড়ে এল ডিক।

'আশ্চর্য! ডিঙিটা পর্যন্ত আছে ওখানে। কিন্তু প্যাডি কোথায়?' এমেলিনকে জিজ্ঞেস করল ডিক।

'জানি না,' কান্নাভেজা স্বরে বলল এমেলিন। হঠাৎ একাকী মনে হচ্ছে ওর নিজেকে।

'চলো, পাহাড়টার মাথায় যাই,' ডিক বলল, 'ওখানে নিশ্চয়ই ওকে পাওয়া যাবে।'

পাহাড়ের মাথায় চড়তে চড়তে ওরা বাটনের নাম ধরে ডাকতে লাগল। প্রতিধ্বনি ফিরে এল। একঝাঁক পাখি উড়ে গেল গাছ ছেড়ে।

পাহাড়ের মাথায় বড় পাথরটা নীরবে দাঁড়িয়ে আছে ছায়া ফেলে। সাগরের ঢেউ দেখা যাচ্ছে এখান থেকে। বাতাসের

ঝাপটায় নাচছে গাছের পাতা। বাতাসের বেগ বেশি এখানে। প্রশান্ত মহাসাগরের দূরে কোথাও হয়তো হ্যারিকেন বইছে।

'আরে! ওই তো প্যাডি!'

ডুবোপাহাড়ের খাঁড়ির দিকে আঙুল তুলে ডিক দেখাল এমেলিনকে। দূর থেকে দেখা যাচ্ছে পিপের পাশে একটা উঁচু হয়ে ওঠা প্রবাল-স্তূপের ছায়ায় শুয়ে আছে বাটন।

'ঘুমুচ্ছে,' বলল ডিক।

'ডিকি, ডিঙিটা তো এখানেই। গেল কি করে?' এমেলিন বলল।

'কি জানি। যে ভাবেই হোক গেছে। এম, চলো আমরা ওখানে যাই। ওর কানে কু দেব, দেখবে কেমন লাফিয়ে ওঠে।'

এমেলিন কিন্তু হাসল না। পাহাড় থেকে নেমে এল ওরা। আসবার পথে অনেক ফুল জোগাড় করে মালা গেঁথে নিল এমেলিন।

'কি সব বানাচ্ছ?' জিজ্ঞেস করল ডিক। আসলে এমেলিনের এই মালা বানানোর শখকে সে করুণা ও বিরক্তির দৃষ্টিতে দেখে।

'মি. বাটনের গলায় পরিয়ে দেব,' বলল এমেলিন। 'যেই কানে কু দেবে, অমনি এটা পরিয়ে দেব গলায়, ভারি মজা হবে।'

হেসে উঠল ডিক মজা পেয়ে। ডিঙির কাছে গিয়ে দড়ি ধরে টেনে আনল ওটাকে পাড়ে। চড়তে বলল এমেলিনকে। পৌঁছুনোর পর–নৌকাটা খুব সাবধানে ভিড়াল পাড়ে। যাতে ঘুম ভেঙে না যায় বাটনের। তাহলে মজাটাই নষ্ট হবে। পা টিপে টিপে এগিয়ে চলল ওরা। এমেলিনের হাতে ফুলের মালা। এখন পূর্ণ জোয়ার। ডুবোপাহাড়ে আছড়ে পড়ছে ঢেউ, গির্জার গম্ভীর অর্গানের ধ্বনি তুলছে। বাতাসের সাথে জলের ছাঁট। অশরীরী পাখির মত হি-হি-হি করে ডেকে যাচ্ছে সী-গালগুলো।

প্যাডি বাটন শুয়ে আছে কাত হয়ে। ডান হাতের কনুই-এর

নিচে তার মাথা। ট্যাটু করা বাঁ হাতটা নিতম্বের উপর লম্বমান। টুপি নেই মাথায়। বাতাসে উড়ছে ধূসর চুল।

পা টিপে টিপে এগিয়ে গেল ওরা বাটনের কাছে। এক ঝলক হাসি হেসে মাথা ছুঁয়ে দিল এমেলিন। হাঁটু গেড়ে কু দিল ডিক ওর কানের কাছে। কোন নড়াচড়ার লক্ষণ দেখা গেল না। আবার কু দিল ডিক, একটু জোরে। উঁহু, সাড়া নেই কোন।

'প্যাডি!' ডিক চেঁচিয়ে উঠল, 'ওঠো, ওঠো।' কাঁধ ধরে তুলবার চেষ্টা করল। কাত হয়ে ঘুরে চিৎ হয়ে গেল শরীরটা। চোখ দুটোতে শূন্য দৃষ্টি। হাঁ হয়ে আছে মুখ। একটা কাঁকড়া বেরিয়ে এল মুখ থেকে। পালিয়ে গেল ছুটে। প্রবালের শূককীটেরা খেয়ে ফেলেছে বাটনের মুখের আধখানা।

এমেলিনের তীক্ষ্ণ একটানা চিৎকারে ভরে গেল দ্বীপের খোলা আকাশ। পড়ে যাচ্ছিল, ঝট করে ধরে ফেলল ওকে ডিক। শক্ত হাতে জড়িয়ে রাখল বুকের সাথে। চেয়ে আছে বীভৎস মূর্তিটার দিকে। এমেলিনকে টানতে টানতে নৌকোটার কাছে নিয়ে এল। প্রচণ্ড ভয় পেয়েছে সে। হাঁপাচ্ছে সে হাপরের মত। পালাও—এখান থেকে পালাও। এই একটাই চিন্তা ওর মাথায়। কোনরকমে এমেলিনকে নৌকায় তুলে দিয়ে লাফিয়ে উঠে পড়ল সে। সবেগে বৈঠা বেয়ে চলল। কি হয়েছে ওখানে? জানে না সে। কেন হয়েছে? জানে না। একটা অজানা আতঙ্কে হিম হয়ে গেছে ওর সারা শরীর। প্রাণপণে নৌকা বেয়ে চলল সে।

নির্বাক এমেলিন নীল আকাশের দিকে চেয়ে আছে একপাশে মাথা রেখে। জোয়ারের ধাক্কায় নৌকা উঠে এল বেলাভূমিতে। লুটিয়ে পড়ল এমেলিন। জ্ঞান হারিয়েছে সে।

সেই রাতে।

ছোট কুটিরটাতে জড়াজড়ি করে শুয়ে আছে ওরা দুজন।

ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে ওদের কাছে আজকের রাতটা। ভয়ে, আতঙ্কে বোবা হয়ে গেছে। খোলা দরজাটার দিকে বারে বারে চোখ চলে যাচ্ছে, এই বুঝি বাটনের বিরাট শরীরটা দরজা জুড়ে দাঁড়াল। বাটন সম্পর্কে ওরা একবারও আলোচনা করার সাহস পায়নি। বুড়ো নাবিকের কি হয়েছে জানে না ওরা। ভয়ঙ্কর কিছু একটা হয়েছে, এটুকু বুঝতে পারছে। কিন্তু এ নিয়ে কথা বলার সাহস ওদের নেই।

এই দু'টি শিশু দর্শন শেখেনি। জীবনকে আড়ালে রেখে ভাবতে পারছে না মৃত্যুই হলো মানুষের স্বাভাবিক পরিণতি। জন্মিলে মরিতে হবে। অথবা মৃত্যু হলো জীবনের দরজা। কিন্তু বাস্তবে যা দেখেছে ওরা তা হচ্ছে এক বৃদ্ধ নাবিকের পচে ওঠা শবের খোলা স্থির দুটো চোখ, হাঁ করা মুখ থেকে বেরিয়ে আসছে কাঁকড়া–এ দৃশ্য কে মুছে দেবে ওদের মন থেকে?

এই ভয়ঙ্কর রাতে হঠাৎ ডিক অনুভব করল তার দায়িত্ব বেড়ে গেছে অনেক। পৌরুষের সুপ্তবীজ জেগে উঠল মনে। এক রাতেই চারা গাছটি বৃক্ষে পরিণত হয়েছে। ভোরে ঘুমিয়ে পড়ল এমেলিন। নিঃশব্দে কুটির ছেড়ে বেরিয়ে এল ডিক। সৈকতে দাঁড়িয়ে থাকল সে। আকাশে ভোরের আলো। হাওয়া ভেসে আসছে সমুদ্র থেকে। জোয়ারের সময়। ডিঙিটা ভাসছে জলে।

'আমাদের চলে যেতে হবে এখান থেকে,' হঠাৎ স্থির করল ডিক, 'কিন্তু কোথায়?' কোথায়–জানে না ও। সূর্য উঠছে পুব দিগন্তে। নারকেল গাছের মাথায় আলোর খেলা। বাতাসে দুলছে বড় বড় পাতাগুলো। কুটির থেকে সমস্ত জিনিস একে একে বয়ে নিয়ে ডিঙিতে জমা করল ও। জলের পাত্রে ভরে নিল ঝর্নার জল। কিছু কলা আর রুটিফল তুলে নিল ডিঙিতে। আর নিল গত রাতের অভুক্ত খাবার। এমেলিন তখনও ঘুমুচ্ছে। দু'হাতে তুলে নিল ওকে ডিক। শুইয়ে দিল নৌকার পাটাতনে। নৌকা ঠেলে

লাফিয়ে উঠল। লেগুনের পাড় বাঁ হাতে রেখে তীরের কাছাকাছি নৌকো বাইতে লাগল সে। ঠিক করেছিল তাকাবে না ডুবোপাহাড়ের দিকে। কিন্তু বার বার পিছলে গেল দৃষ্টি। ওখানে অসংখ্য পাখির ঝাঁক। নিজেদের মাঝে চিৎকার, ঝগড়া আর মারামারি করছে ওগুলো। সী-গালের হি-হি-হি শব্দ আর ডানার ঝাপটানি শুনতে পাচ্ছে ডিক। একটা বাঁকে নৌকা ঘুরে যেতেই চোখের আড়ালে চলে গেল দৃশ্যটা। পাড় ধরে বেয়ে চলেছে নৌকা। সারি সারি কাঁঠাল আর নানা রকম ফলের গাছ। ফার্নে ভরা বিস্তীর্ণ তৃণভূমি, ঘন নারকেল গাছ পার হয়ে গেল। আশ্রয় নেবার মত জুতসই মনে হলো না তবু ডিকের। সে খুঁজছে খোলামেলা জায়গা। সমস্ত দ্বীপটা ঘুরে জায়গাটা পেল সে।

স্তব্ধ নীল জলের ধারে দুপাশে ঘন বনের মাঝখানে একটা বাগান। পরিষ্কার জায়গাটা ধীরে ধীরে উঠে গেছে উঁচু হয়ে। রঙ-বেরঙের ফলের বড় বড় গাছ, তাল গাছের পাতা দুলছে মৃদু মৃদু। লেগুনের জল এখানে অগভীর কিন্তু স্বচ্ছ। নীলকান্ত মণির মত ছড়িয়ে আছে উজ্জ্বল রঙ। ডুবোপাহাড়ের দূরত্ব এখান থেকে অনেক। বিস্তৃত সমুদ্রের অংশ দেখা যায়। নৌকা ভিড়াল ডিক। গভীর নিদ্রা থেকে জেগে উঠল এমেলিন। তাকাল চারদিকে। ওর সামনে অচেনা, নতুন এক পৃথিবী।

চার

শ্যামল ঘাসের জমি, দু'পাশে দুটো গাছ, মাঝখানে একটি কুটির।

কুটিরটা ছোট–মুরগি রাখার ঘরের চেয়ে বড় নয়, কিন্তু অনন্ত গ্রীষ্ম প্রধান এলাকায় দুজনের জন্য যথেষ্ট। বাঁশের তৈরি। দুটো আস্তর পড়েছে ছোট ছোট তালপাতার। দেখতে সুন্দর, মনে হয় অনেক ওস্তাদ কারিগরের হাত পড়েছে এতে।

কাঁঠাল গাছের পাশে কিছু অংশ পরিষ্কার করে সেখানে টারোমূল ও মিষ্টি আলুর চাষ করা হয়েছে। কুটিরের ডানদিকে বনের বিস্তৃতি শুরু। তার আগে বেড়ার মত নারকেল গাছের কুঞ্জকে ঘিরে রয়েছে বৈঁচি গাছ। কুটিরে দরজা আছে। একটি। পাল্লা নেই। প্রায় দোচালার আকারে কুটিরটা তৈরি। ভেতরে প্রচুর খালি জায়গা। মেঝেয় শুকনো ফার্নের সুগন্ধি গালিচা। দরজার দু'পাশে নৌকার পাল গুটিয়ে রাখা। দেয়ালে একটা এবড়োখেবড়ো তাক। সেখানে সাজানো আছে নারকেলে মালার বাসন। কুটিরের অধিবাসীরা রাত ছাড়া এখানে থাকে না।

বিকেলের পড়ন্ত রোদ।

রুটি গাছের বিস্তৃত ছায়া। একটি মেয়ের নগ্ন পা দেখা যাচ্ছে। মেয়েটির বয়স পনেরো কি ষোলো। পরনে ঘাঘরা। কালো লম্বা চুল একটা লতা দিয়ে বাঁধা। কানের পাশে একগুচ্ছ টকটকে লাল ফুল গোঁজা। অপরূপ সুন্দর মুখশ্রী। রোদে পোড়া ফুটকি ফুটকি দাগে আবৃত। গভীর নীল চোখ। আধশোয়া অবস্থায় বসে আছে সে। তার সামনে উজ্জ্বল নীল রঙের ঠোঁটওয়ালা একটা পাখি। নেচে বেড়াচ্ছে ঘাসের উপর।

মেয়েটি এমেলিন লেস্ট্রেঞ্জ।

পাখিটাকে খাওয়াচ্ছে এমেলিন। দু'বছর আগে মা-পরিত্যক্ত, অভুক্ত এই পাখিটিকে বাচ্চা অবস্থায় বনের মধ্যে কুড়িয়ে পেয়েছিল ডিক। ওরা দু'জন খাইয়ে-পরিয়ে পোষ মানিয়ে ফেলেছে ওকে। সেই থেকে পাখিটি এই পরিবারের সদস্য।

'কোকো, বল তো ডিক কোথায়?' পাখিটিকে প্রশ্ন করল

এমেলিন। ঘাড় ঘুরিয়ে এদিক ওদিক তাকাল পাখিটা। হাসতে হাসতে শুয়ে পড়ল এমেলিন ঘাসের ওপর। ভেনাস-এর মত মনে হচ্ছে ওকে। সুগঠিত, পূর্ণ বিকশিত, সুন্দরী এক যুবতী। অপূর্ব! ইতোমধ্যে দ্বীপের উপর দিয়ে চলে গেছে পাঁচটা বর্ষাকাল। পুরানো কুটিরে আর কোনদিনই ফিরে যায়নি ওরা। লেগুনে কোন জাহাজও আসেনি আর। ডিক এক এক সময় নৌকো নিয়ে পুরানো জায়গার আশেপাশে ঘুরত। এই জায়গায় কলাগাছ নেই বললেই চলে। সেদিনের সেই ভীতি আর ভয়ঙ্কর দৃশ্য এমেলিনের স্মৃতি থেকে মুছে যায়নি আজও। অবশ্য ডিক ভুলে গেছে। ডিককে গত পাঁচ বছরে তিনবার নতুন করে বানাতে হয়েছে কুটির। কুটিরের দু'মাইলের মধ্যে প্রতিটি জায়গা তার চেনা। প্রতিটি পাখি, জীব ও পতঙ্গকে সে চেনে—যদিও নাম জানে না। অনেক আশ্চর্য জিনিস দেখেছে এই ক'বছরে সে। তবে তিমির সাথে সমুদ্রের অন্য জীবদের মরণ-লড়াই দেখে সে রোমাঞ্চিত হয়েছে সবচেয়ে বেশি। পেছনের বনে অনেক রকম ফল আবিষ্কার করেছে, কাজেই খাদ্যাভাব নেই।

বনের ভেতর বেত কাটায় ব্যস্ত ডিক। দুটো বেতের বড় টুকরো টানতে টানতে হাজির হলো সে। পরনে ছেঁড়া প্যান্ট, ছিপছিপে শরীরের বাকি অংশ নগ্ন। সোনা-হলুদ রঙ চুল কাঁধ পর্যন্ত নেমে এসেছে। দেখলে মনে হয় ষোলো সতেরো বছর বয়স। নির্ভীক—বন্য একটা ছাপ চোখে মুখে। তেমন একটা কথা সে বলে না। এমেলিন প্রশ্নের জবাব পায় সংক্ষেপে। কিন্তু আপনমনে কথা বলার একটা স্বভাব হয়েছে তার। অনর্থক, আগা-মাথা কিছু নেই এমন সব শব্দ সে আপনমনে করে। বর্তমান-ই তার সম্বল। অতীত হারিয়ে গেছে তার কাছে।

কখনও কখনও তার নিঃসঙ্গতা ভিন্ন রূপ পায়। জলের ওপর মুখ রেখে নিচের বিচিত্র জীবন আগ্রহ নিয়ে দেখে। কখনও একটা পাথরের উপর বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পাখি অথবা গিরগিটিদের দিকে তাকিয়ে থাকে।

'কি বানাচ্ছ তুমি?' প্রশ্ন করল এমেলিন।

বন থেকে এসেই ডিক বেত ছিলতে বসেছে। তীক্ষ্ণ করে নিচ্ছে বেতের ডগা ছুরি দিয়ে।

'মাছ মারা কোঁচ,' বলল ডিক।

ডিকের দিকে চেয়ে থাকে এমেলিন। জীবনে অনেক কিছুই হারিয়েছে সে। তার লেস্ট্রেঞ্জ কাকু, নার্স মিসেস স্ট্যানার্ড, পরম বন্ধু বুড়ো মি. বাটন, তার অতি সাধের বাক্স। মিলিয়ে গেছে সব স্বপ্নের মত। এখন ডিক-ই তার একমাত্র সহায়। ডিক যদি হারিয়ে যায়! বুক কেঁপে উঠল তার। এই দ্বীপে একা একা থাকবে কি করে? ভয়ে ঢোক গিলল সে। নিজের সত্তা বলে কোন কিছুই বাকি রাখেনি এমেলিন। শুধু ডিক আর ডিক। অবশ্য মুখ ফুটে কোনদিন বলেনি সে ডিককে। সেই ছেলেবেলা থেকেই দুঃখ, বেদনা, আনন্দ--সব কিছুই নিজের মনের গোপন কুঠুরিতে লুকিয়ে রাখতে অভ্যস্ত সে। বেতের ডগা সরু করে উঠে দাঁড়াল ডিক।

'কোথায় যাচ্ছ?' জিজ্ঞেস করল এমেলিন।

'খাঁড়িতে।'

'আমি যাব।'

ডিক কুটিরে গিয়ে ছুরিটা রেখে সঙ্গে নিল কিছু লায়না লতা। বড় মাছ গাঁথলে ওগুলো দিয়ে বেঁধে নিয়ে আসা যায়। ডিঙির-দিকে এগিয়ে গেল সে। এমেলিন ডিঙিতে চড়লে বৈঠা বাইতে শুরু করল ডিক। জোয়ারের জল নেমে যাচ্ছে। ভাটায় লেগুনের পানি বিপজ্জনক। এখানে অনেক অজানা গর্ত আছে, আছে বিচিত্র আগাছায় ভর্তি মরণফাঁদ, পচা প্রবালের স্তূপে ডুবে গেলে জন্মের

মত হারিয়ে যেতে হবে। ডিকের সবকিছু জানা। একটা প্রবাল দ্বীপে ডিঙি থামাল সে। নৌকা থেকে নামতে সাহায্য করল এমেলিনকে। পশ্চিমের আকাশে ঝুলে পড়েছে এখন সূর্য। বদ্ধ জলাশয়ে সূর্যের আলো পড়ে ঝলমল করছে যেন একটা চকচকে ঢাল। একটা প্রবাল-স্তূপের ধারে বসে খুলে ফেলল ডিক পুরানো প্যান্ট। ঘাড় ফিরিয়ে দূরের একটা পাড়ের দিকে চেয়ে আছে এমেলিন। হঠাৎ দেখল প্রবালের পাড় ধরে ছুটছে ডিক। কোঁচ হাতে ওকে মনে হচ্ছে একটা বনমানুষ। মুহূর্তে একটা তীব্র ঢেউ ঢেকে ফেলল ডিককে! শক্ত হয়ে দাঁড়াল ও। নেমে গেল ঢেউ। চিকচিক করে উঠল ওর নগ্ন দেহ। আবার ছুটল। ছুটতে ছুটতে ওর কোঁচসহ পেশল হাত ওঠানামা করছে দ্রুত। মাছের দেহে গেঁথে যাচ্ছে কোঁচ, উঠে আসছে উজ্জ্বল মাছসহ। একের পর এক মাছ মারার নেশায় উন্মত্ত সে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত মাছ মারতে ক্লান্তি নেই তার।

একশো গজ দূরে বসে এসব দেখছিল এমেলিন। তার মন তখন দেখছে প্রকৃতির খেলা। সাগর আর সাগরতলে রঙের খেলা। কতরকম প্রবাল-স্তূপ, কত রঙ তাদের। হলুদ বরণ সামুদ্রিক ফুল– গাজরের মত। গোলাকার জেলি, কাটল মাছের খোলা, হাঙরের দাঁত, মৃত স্কারাস, কাঁকড়া, সামুদ্রিক শজারু, বিচিত্র বর্ণ ও আকারের সামুদ্রিক আগাছা, সামুদ্রিক লংকা। এমনি সব ভয়ঙ্কর সুন্দর জিনিসে লেগুনের এ অংশ ভরা।

পরিশ্রান্ত ডিক মাছগুলো জমিয়ে রাখছে পাড়ে। কোঁচটা রাখল প্রবালের মেঝেয়। স্নান করবে। হাঁটু জলে নেমে এগিয়ে গেল আরও। ডিকের ফর্সা দেহ ঝিকমিক করছে। দু'হাতে পানি সরাল সে। ডুব দিতে যাবে–আচমকা একটা হেঁচকা টান অনুভব করল সে। পা ধরে টানছে কে যেন। ক্রমশ একটা দড়ি পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে উঠছে পায়ের পাতা থেকে। ভয়ে, আতঙ্কে, যন্ত্রণায় চিৎকার করে

উঠল সে। তখুনি পানিতে ছপাৎ শব্দ করে আর একটা শুঁড় জেগে উঠেই তার বাঁ হাঁটু জড়িয়ে ধরল শক্ত করে।

তন্ময় হয়ে বেলা ডোবা দেখছে এমেলিন। হঠাৎ একটা ভয়ার্ত চিৎকারে সংবিৎ ফিরে পেল। দৃষ্টি ঘুরে গেল ডিকের দিকে। নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ডিক পানির ওপর। দু'হাত ওপরে তোলা। সাহায্য চাইছে। ধড়াস করে লাফিয়ে উঠল কলজেটা। এক লাফে উঠে দাঁড়াল সে। ছুটল। কাছে পৌঁছুতেই ভয়ে হিম হয়ে গেল এমেলিন। দড়ির মত কি একটা ডিকের সর্বাঙ্গ পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে উঠছে। সমস্ত শরীর কাঁটা দিয়ে উঠল এমেলিনের। মেরুদণ্ড বেয়ে নেমে এল হিম শীতল স্রোত।

'আমার কোঁচ–কোঁচটা,' চিৎকার করে উঠল ডিক। জিনিসটা কুৎসিত, বীভৎস। দ্রুত দৌড়ে কোঁচটা নিয়ে এল সে। দড়িগুলো জীবন্ত–স্পষ্ট দেখছে এখন এমেলিন। ততক্ষণে একটা শুঁড় জড়িয়ে ধরেছে ডিকের বাঁ হাত। খোলা শুধু ডান হাত। এমেলিনের হৃৎপিণ্ডটা প্রবল বেগে বাড়ি খাচ্ছে বুকের পাটাতনে। ডিকের দিকে কোঁচটা ছুঁড়ে দিয়ে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল এমেলিন কাঁপতে কাঁপতে। ডিক বিপদে পড়েছে। ভয়ে, আতঙ্কে বিবর্ণ এমেলিন। ভাবছে, ঝাঁপিয়ে পড়বে কিনা ওকে বাঁচানোর জন্য। সেই মুহূর্তে দেখতে পেল সে ভয়ঙ্কর জীবটিকে। আকৃতিটা ভীষণ। বিষণ্ন মুখ। চোখ দুটো ঘুরছে। পায়রার মত ঠোঁট চোখের নিচেই। জমে বরফ হয়ে গেল এমেলিন ওটার চোখের দিকে চেয়ে। ঠাণ্ডা ভাবলেশহীন দৃষ্টি। অক্টোপাস।

পানির ওপর আছড়ে ডিকের অন্য পা জড়িয়ে ধরল অক্টোপাসের আরেকটা শুঁড়। বিদ্যুৎবেগে কোঁচটা বসিয়ে দিল ডিক দানবটার চোখ লক্ষ্য করে। জল কালি করে অক্টোপাসটা বাঁধন ছেড়ে দিল। ডিকের হাত তখনও উঠছে-নামছে। প্রচণ্ড রাগে ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছে জীবটাকে।

'ডিক!' এমেলিন ছুটে গেল পাগলের মত। নিজেকে ফিরে পেল ডিক এতক্ষণে। হাঁপাচ্ছে। কপালের ঘাম মুছে সে ফিরে তাকাল কোঁচটার দিকে। ভেঙে দু'টুকরো হয়ে গেছে ওটা। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে এমেলিন ওর বুকে মুখ লুকিয়ে। শক্ত হাতে চেপে ধরল ওকে ডিক। বুক ভেসে গেল অশ্রুতে। চুমু খেল ওর কপালে।

'শয়তানটার চোখ দেখেছ তুমি!' চুমু খেতে খেতেই বলল ডিক, 'মনে হচ্ছিল যেন একশোটা চোখ।'

কোন কথা বলল না এমেলিন। ও একবার হাসছে আবার কাঁদছে।

বেলা ডুবে গেছে। প্যান্ট কুড়িয়ে নিয়ে পরে নিল ডিক। মাছগুলো তুলল নৌকোয়। বৈঠা ধরল শক্তিশালী হাতে।

ভোরবেলা।

আজ আবার নৌকো নিয়ে বেরুল ডিক মাছ ধরবার জন্য। কাছাকাছি নয়। পুরানো জায়গায় যাবে সে। ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা হয়েছে তার গতকাল। বড়শি, সুতো আর টোপ নিয়ে রওয়ানা হয়েছে ঘুম থেকে উঠেই। এমেলিন হাত নাড়ছে, নৌকো চলে যাচ্ছে ওর দৃষ্টির আড়ালে। ডিকের অনুপস্থিতিতে তার জীবন হয়ে ওঠে ভয়াবহ। এই বেদনার কথা বলে না সে কখনও মুখ ফুটে।

বড়শি ফেলল ডিক। টান পড়ল সুতোয়। দুলে উঠল নৌকো। প্রথমে টের পায়নি, এবার টানটা জোরাল। যেন নৌকো থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে তাকে। নৌকার দুলুনি হয়ে উঠল ভীষণ। বড়শি গিলেছে একটা অ্যালবিকোর। ঘণ্টাখানেক চলল লড়াই। যুঝতে যুঝতেই হঠাৎ হালকা হয়ে গেল সুতোর টান। পানির ওপর জেগে আছে একটা ছায়া। সুতো টানল সে ঝটকা মেরে। বেশ ঢিল

পড়েছে। হায়-হায়! বড়শিতে গাঁথা শুধু অ্যালবিকোরের মাথাটা। নিপুণ অস্ত্রোপচার করে গায়েব করে দিয়েছে ধড়। গালাগালি করল ডিক ঝাড়া পাঁচ মিনিট প্রতিদ্বন্দ্বীকে। দু'হাত তুলে আড়মোড়া ভেঙে বসে পড়ল ধপ্ করে। জিরাল খানিকক্ষণ। বড়শি থেকে মাথাটা খুলল হেঁচকা মেরে। পানিতে ছুঁড়ে দিয়ে জিদ মিটাল। পানিতে মাথাটা গা ঠেকাতেই ভেসে উঠল ছায়ামূর্তিটা। ওটাকে মুখে নিয়েই অদৃশ্য হয়ে গেল জলের অতলে।

ফিরে চলল ডিক। পুরানো কুটির এখান থেকে কাছে। যাবে সে। দাঁড় টানার একটানা শব্দ, সাথে ঢেউয়ের গর্জন–এই। আর সব সুনসান। মাইল তিনেক নৌকো বাইল সে। দাঁড় বাইতে বাইতে বক বক করে চলেছে সে। নিজের মনে কথা বলার অভ্যেস ওর এই ক'মাসের। কারণ এমেলিন। ছ'মাস আগে পর্যন্ত ডিক খুশি ছিল নিজেকে নিয়ে। ঘুম, খাওয়া, শিকার, কুটির তৈরি, বনে আর খাঁড়িতে নতুন নতুন আবিষ্কার করা নিয়েই সন্তুষ্ট ছিল সে। কিন্তু হঠাৎ একটা অদ্ভুত অস্বস্তি আর অনুভূতি পেয়ে বসেছে তাকে। ঠিক কি, কেমন আর কেন এই অস্বস্তি তা সে জানে না। মাঝে মাঝেই তার মনে হয় কোথাও চলে যাবে সে। ওই এমেলিনের জন্য। আশ্চর্য এক পরিবর্তন লক্ষ করেছে সে এমেলিনের মাঝে। ছোটবেলা থেকে যাকে সে চিনত সে যেন এ নয়। অচেনা। চেহারাও অন্যরকম। ওর সৌন্দর্য সম্পর্কে ডিক যতটা অভিভূত তার চেয়ে ওর দৈহিক পরিবর্তন তাকে অবাক করেছে বেশি। আর নতুন কতগুলো কাজ করছে এমেলিন যা ওকে ভীষণ ক্ষিপ্ত করে তোলে। যেমন, গোসল করতে যাবে একা। কি একটা আড়াল করতে চায় সে।

খাঁড়ির কাছাকাছি চলে এসেছে ডিক ডিঙি বেয়ে। একটা কোণে দৃষ্টি আটকে গেল ওর। যতবার সে এখানে এসেছে না তাকিয়ে পারেনি। পাঁচ বছর আগের সেই আতঙ্কটুকু কেটে গেছে

অবশ্য। আজও সম্মোহিতের মত চেয়ে থাকল। প্যাডি। নেই। কোথায় গেছে সে? ভয়ের একটা হিমশীতল পরশ ওর শরীর ছুঁয়ে গেল যেন।

নৌকো ভিড়াল সে সৈকতে। কিছু একটা হয়ে গেছে এখানে। বালুকাবেলা তছনছ। চারদিকে ছড়িয়ে আছে রক্তের ছোপ। কারা বুঝি আগুন জ্বেলেছিল মাঝখানে। ধোঁয়া উড়ছে সেখানে। দুটো গভীর দাগ সৈকতে। বড় ওজনদার ক্যানো ভিড়েছিল সেখানে। সম্ভবত গতকাল বিকেলে এসেছিল ওরা। দূরের কোন দ্বীপ থেকে হয়তো। এরপর কি হয়েছে এখানে? জানে না ডিক। রহস্যময় কিছু। কালরাতে এমেলিন অবশ্য তাকে বলেছিল কেমন যেন শব্দ পাচ্ছে সে। কোলাহল, সাথে দি-দ্দিড়িম দি-দ্দিড়িম শব্দ। বাতাস আর সমুদ্রের গর্জনে তা এতই অস্পষ্ট ছিল যে ডিক মনোযোগ দিয়েও দেয়নি। আগন্তুক এসেছিল, চিহ্নগুলো দেখে ধারণা হলো ওর। সারারাত উৎসব করে চলে গেছে ভোরে। পাড়ে লম্বা একটা দাগ, কাটা–এখনও অক্ষত রয়েছে। তার মানে, ক্যানোয় চেপে আসা আগন্তুকদের কাছে এই দ্বীপ ট্যাবু বা নিষিদ্ধ।

পাড়ে নেমে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল ডিক। তীরের ভাঙা একটা অংশ কুড়িয়ে পেল। কাঠের বাঁট, আগাটা লোহার। একটু এগোল সে। নারকেল গাছের নিচে পড়ে আছে মরা জন্তুর ফেলা অংশ। উৎসর্গীকৃত পশুর নয়, বোঝা যায়। দ্বীপে ভেড়া বা ছাগল নেই, আর আদিবাসীরা ওই জাতীয় পশু ক্যানোতে নেয় না। একজন মানুষকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সৈকতের বালু যেন সেই কথাই বলতে চায়। তার পতনের ছাপ বালুর উপর স্পষ্টভাবে আঁকা। পিটিয়ে শোয়ানো হয়েছে। তারপর ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে কোন অস্ত্র। কাটা মুণ্ডুটা টেনে নিয়ে গেছে কেউ। কান পেতে চিৎকার, হুঙ্কার, কুঠারের সংঘর্ষ, তীরের শনশন ধ্বনি যেন শুনতে পেল ডিক। ওদের দামামার চিহ্ন নেই কোন, কিন্তু অশরীরী রূপ

যেন জেগে আছে।

যাক বিপদ কেটে গেছে, ভাবল ডিক। কিন্তু গেল কোন্ দিকে? সমুদ্রের দিকে না লেগুনের ভেতর? পাহাড়ের মাথায় চড়ল নিশ্চিত হবার জন্য। দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে স্পষ্ট ধোঁয়ার রেখা। দুটো ক্যানোর ধূসর পাল দেখা যাচ্ছে। পালাচ্ছে ওরা। কাজ শেষ করে পালাচ্ছে নিষিদ্ধ দ্বীপ ছেড়ে।

পাহাড়ের মাথায় উঁচু পাথরটার পাশে হাঁটু মুড়ে হাতের ওপর হাত রেখে বসল ডিক। ভাবছে। এইদিকে যতবার এসেছে সে, প্রতিবারই ঘটেছে অঘটন। নৌকাটা হারিয়ে গিয়েছিল সেবার। কি করে যেন দড়ি খুলে ভেসে গিয়েছিল স্রোতে। প্রাণপণে সাঁতার কেটে ধরে ফেলেছিল সে কোনরকমে। আরেকবার গাছ থেকে পড়ে গিয়েছিল সে। বেঁচে গিয়েছিল প্রায় অলৌকিকভাবে। হ্যারিকেনের দাপটে মরেই যেত সেবার। বাঁচবার কারণটা দুর্বোধ্য। 'এখানে এসো না,' কে যেন বলে গেল ওর কানের পাশে।

পাহাড় থেকে নেমে চার ছড়া কলা কেটে নিয়ে নৌকোয় তুলল সে। বৈঠা চালাল নৌকোয় চড়ে। খাঁড়ির দিকে ঘুরিয়ে দিল খানিকটা এগিয়ে। পালিয়ে এসেছিল ওরা সেবার এখান থেকেই। পাঁচবছর আগের কথা মনে হচ্ছে যেন গতকালের ব্যাপার। খাঁড়িতে এখনও ঢেউয়ের গর্জন, উড়ন্ত সী-গাল, সূর্যের প্রখর আলো, লবণাক্ত বাতাস—সব আছে। কোরালের যে অংশটা থেকে দড়ি ছিঁড়ে পালিয়েছিল নৌকা, সেই ছেঁড়া দড়িটা আজও আছে। চেহারাটা মলিন। গত ক'বছরে এখানে এসেছে কত জাহাজ। ঢেউ তাড়িয়ে নিয়ে এসেছে একটা জাহাজের ভাঙা অংশ খাঁড়ির পাহাড়ে।

পাহাড়ে চড়ল ডিক। জোয়ারের সময়। একটা বড় কালো পাখি তার রক্তরাঙা ঠোঁট নিয়ে ডিকের মাথার ওপরে চক্কর কাটল

AMARBOI.COM

খানিকক্ষণ। উড়ে গেল সাগরের দিকে। এগিয়ে গেল ডিক চেনা জায়গাটার উদ্দেশে। পিপেটা পড়ে আছে একলা। কাঠগুলো খুলে গেছে। ভিতরের তরল পদার্থ গড়িয়ে গেছে কবেই।

ভাঙা পিপেটার পাশে একটা কঙ্কাল। কয়েক টুকরো কাপড় ন্যাকড়ার মত ঝুলছে কঙ্কালটার শরীরে। একপাশে খুলে পড়ে আছে করোটি। নিচের চোয়াল বিচ্ছিন্ন। হাত-পা ও পাঁজরার হাড় লেগে আছে জোড়ায় জোড়ায়। সাদা ধবধবে দেখাচ্ছে সূর্যের আলোয়। অনেকক্ষণ নির্নিমেষে চেয়ে থাকল ডিক ওটার দিকে। পলক নেই। হঠাৎ দীর্ঘ একটা শ্বাস বেরিয়ে এল ওর বুক ভেঙে। অজান্তেই। নৌকোয় ফিরে এল সে। মৃত্যু কি জানে না ডিক।

কুটিরের কাছে মাথা তুলে দেখল দাঁড়িয়ে আছে এমেলিন।

'এটা কোথায় পেলে?' লোহার ভাঙা টুকরোটার দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল এমেলিন। দেখতে অনেকটা বল্লমের মত। বাঁটের আগায় লোহার ফলাটা কালো হয়ে আছে। কোন জবাব দিল না ডিক। ভাঙা বল্লমটা নিয়ে ব্যস্ত সে এখন। কাঠফাটা রোদ। অনেকক্ষণ ধরে এটার পেছনে লেগেছে সে। ঘেমে নেয়ে উঠেছে। ভাঙা অংশ নারকেলের পাতা দিয়ে বাঁধল। নিখুঁত হয়েছে। পরিষ্কার করল ওটা। মাটি ও কাপড় দিয়ে ঘষে ঘষে চকচকে করে ফেলল ফলাটা। এবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছে সে ওটাকে। মাছ ধরার কোঁচ হিসেবে অচল, কারণ কোন কাঁটা নেই। কিন্তু জিনিসটা ভাল একটা অস্ত্র। কিন্তু কার বিরুদ্ধে ব্যবহার করবে এটা? এখানে তো কোন শত্রু নেই, ভাবল সে। বল্লমটা আরও চকচকে করে ঘরের ভেতর থেকে মাছ মারা কোঁচটা নিয়ে এল সে। নৌকোর দিকে এগিয়ে যেতে যেতে চেঁচিয়ে ডাকল এমেলিনকে। ডুবোপাহাড়ের কাছে গিয়ে ছোট প্যান্টটা খুলে ফেলল। এক হাতে বল্লম আর এক হাতে কোঁচ নিয়ে নেমে গেল জলে। প্রবালের একটা স্তূপের

উপর বসে আছে এমেলিন। তার স্বপ্নের দরজা খুলে গেছে। হঠাৎ চিৎকারটা শুনল সে। চমকে তাকাল ডিকের দিকে। আঙুল দেখিয়ে কি যেন বলছে ডিক। সেদিকে তাকিয়েই চোখ বড় বড় হয়ে গেল তার।

ডুবোপাহাড়ের বাঁকে, মাইলখানেক দূরে, একটা দ্বি-মাস্তুল জাহাজ এগিয়ে আসছে পুবদিক থেকে। বাতাসে ফুলে উঠেছে পালগুলো। ফেনার মত জল কেটে কেটে এগিয়ে আসছে সেটা। জাহাজের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে ডিক পাথরের মূর্তির মত। হাতে বল্লম। এমেলিন এক ছুটে তার পাশে পৌঁছে গেল।

খানিকক্ষণ পরে জাহাজের রেলিঙ দেখা গেল। ঝুঁকে পড়ে দেখছে অনেক লোক। ওরা দুজন। বাতাসে উড়ছে এমেলিনের চুল। হঠাৎ মোড় ঘুরে গেল জাহাজটা।

'চলে গেল,' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল এমেলিন। কোন উত্তর দিল না ডিক। জাহাজটার চলে যাওয়া দেখছে অপলক চোখে। হঠাৎ যেন খেয়াল হলো তার কর্তব্যের কথা। পাড় ধরে ছুটতে লাগল সে। পাগলের মত দু'হাত তুলে ডাকছে সে আরোহীদের। ক্ষীণ একটা জবাব বুঝি ভেসে এল জাহাজ থেকে। তারপর নিজের পথে চলে গেল ওটা।

সত্যি কথা বলতে জাহাজের ক্যাপ্টেন এই দ্বীপবাসীদের সম্পর্কে মনস্থির করতে পারেনি। বল্লম হাতে নগ্ন ডিক আর এমেলিনকে ওরা দ্বীপের আদিবাসী মনে করেছে।

২

বসন্তকাল। সকাল বেলা।

এমেলিনের পোষাপাখি কোকোর সঙ্গী জুটেছে। বনে এসেছে রঙ বেরঙের ফুল। পুরো দ্বীপ জুড়ে পরিবর্তনের সাড়া। কোকো আর তার পুরুষ সঙ্গীর বাসা বাঁধা শেষ। বন থেকে পেয়ারা সংগ্রহের জন্য একটা বাস্কেট তৈরি করছে ডিক।

রোদের তীব্রতা কমে এলে বেতের ফিতের সাহায্যে বাস্কেট পিঠে ঝুলিয়ে চলতে শুরু করল বনের দিকে। সাথী এমেলিন। ঘুরতে ঘুরতে একটা জায়গা আবিষ্কার করে ফেলেছে ডিক। বনের গভীরে ঢুকে ওরা পেরিয়ে এল একটা কুয়ো। ওটার নিচে শুকনো সাদা বালু। কুয়োটাকে ডানে রেখে আরও খানিকটা এগিয়ে গেল একটা পায়ে চলা পথ ধরে। জনমানবশূন্য এই দ্বীপে গাছের নিচ দিয়ে এই পথ কোত্থেকে এল–কে জানে। বনের ঘনত্ব বাড়ল। হঠাৎই শেষ হয়ে গেল পথটা। সামনে ফার্ন বিছানো একটা উপত্যকা। এখানে এলেই একটা অজানা আতঙ্কে ভরে যায় এমেলিনের মন। একপাশে একটা চত্বর। বড় বড় পাথরের চাঙড়ে তৈরি। বিরাট চাঙড়গুলো জোড়া লাগানো। চত্বর ভেদ করে উঠে গেছে বড় বড় গাছ। একটা বিরাট পাথরের কর্কশ মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে এক কোণে একটু ঝুঁকে। তিরিশ ফুট উঁচু। গম্ভীর, রহস্যময়। এটাকে দেখলেই শিরশির করে ওঠে এমেলিনের সারা শরীর। গা ছমছম করে দিনের আলোতেই। এই মূর্তির নাম দিয়েছে এমেলিন 'শিলা-মানব'।

পাথরের চত্বরে ভীতা এমেলিন বসে পড়ল নির্জীবের মত। ডিকও শুয়ে পড়ল। বিশ্রাম। সেই ভোর থেকে খেটেছে বাস্কেটটা তৈরি করতে। তারপর এই পেয়ারা সংগ্রহ। কয়েকটা পেয়ারা এমেলিনকে দিয়ে নিজে খেল। খাওয়া শেষ। বাস্কেটের সাথে বাঁধা বেতটা বের করল এমেলিন। খেলবে। ধনুকের মত করে বাঁকাল ওটা। হঠাৎ ছুটে গেল এক প্রান্ত। ছিটকে ঘা দিল ডিকের মুখে। আচমকা ব্যথা পেয়ে ডিকের হাত উঠে গেল ওপরে। নেমে এল সজোরে এমেলিনের গালে।

অবাক হয়ে চেয়ে আছে এমেলিন ডিকের দিকে। কাঁপছে ঠোঁট।

রাগ পড়ে গেল ডিকের। এমেলিনের বোবা দৃষ্টি ওকে কেমন

যেন করে দিল। জড়িয়ে ধরল এমেলিনকে। জোরে। কি করবে ভেবে পাচ্ছে না ডিক। শুধু প্রাণপণে চেপে ধরল সে এমেলিনের শরীরটা নিজের সাথে। হঠাৎ যেন খুঁজে পেল এমেলিনের ঠোঁট জোড়া। কম্পিত ঠোঁটে মিশে গেল ডিকের ঠোঁট।

তারপর কি যে হয়ে গেল ওদের!

পাঁচ হাজার বছর আগের রহস্যময় মূর্তিটার মাথার ওপর উঠেছে চাঁদ।

দিন কেটে যায়।

সেদিন। সাঁঝের বেলা। চাঁদের নরম আলোয় বসে আছে ওরা দু'জন। কথা বলছে এমেলিন। ছেলেবেলা থেকে এমেলিনের নীরব থাকার দোষ। দূর হয়ে গেছে সেটা। সে তার স্বপ্নের কথা কবিতার মত বলে ডিককে। তার স্বপ্নে এখনও পরীরা আছে। ডিকের মনে হয় যেন ঝর্নার গান শুনছে সে। এমেলিনের কবিতার মত স্বপ্নময় জগতের অংশীদার হবার মত মানসিক অবস্থা অবশ্য তার নেই। তবু ভাল লাগছে। কথা শুনতে শুনতে এমেলিনের উজ্জ্বল কালো চুলে মুখ ডোবাল। ঘ্রাণটা অদ্ভুত।

খানিক পর।

ডিক খেলা করছে; এমেলিনের প্রতিটি অঙ্গ নিয়ে। শুয়ে শুয়ে উপভোগ করছে এমেলিন। এক সময় দু'বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরল সে ডিককে।

আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ।

কুড়ি মিনিট পর। চোখ বুজে শুয়ে আছে এমেলিন। শব্দ এল পাখির বাসা থেকে। গাছে চড়ল ডিক। নিচে চোখ খুলল এমেলিন। হাসল ডিক। বাসাতে মা-পাখি নেই। চারটি বাচ্চার ঠোঁট থেকে বেরিয়ে আসছে বিচিত্র শব্দ। খিদে পেয়েছে ওদের।

এমেলিনের পোষা পাখি কোকোর সন্তান। ক'দিন আগে ধূসর রঙের ডিমের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে ওরা ওদের অবাক চোখের সামনে।

গালে কার স্পর্শ পেয়ে সচেতন হলো ডিক। খাবার নিয়ে এসেছে কোকো। মাথা সরিয়ে নিল ডিক। নিঃশব্দে এগিয়ে গেল কোকো তার সন্তানদের দিকে।

পাঁচ

প্রশান্ত মহাসাগরের এই অঞ্চলে তাঁকে সবাই 'পাগলা লেস্ট্রেঞ্জ' বলেই জানে।

কিন্তু লেস্ট্রেঞ্জ সত্যিই পাগল হয়ে যাননি। সব বিসর্জন দিয়ে শুধু একটি মাত্র ছবি, তাঁর চোখের সামনে ভাসে–দুটি শিশু, এক বৃদ্ধ নাবিক বিস্তীর্ণ বিশাল নীল সমুদ্রে ভাসছে ছোট্ট একটি নৌকায়।

'প্যাপিটি' বন্দরের দিকে যেতে থাকা 'আরাগো' জাহাজ উদ্ধার করেছে নর্দামবারল্যান্ডের যাত্রী ও নাবিকদের। একমাত্র বড় নৌকাটির আরোহীরাই জীবিত ছিল সে সময়। প্রায় উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলেন ক্যাপ্টেন লা ফার্জ। সম্পূর্ণ মানসিক ভারসাম্য ফিরে পাননি আর। লেস্ট্রেঞ্জ যেন ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেলেন। সে দিনের সেই ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা, দুটি শিশুকে হারানো অসহায় এক ভগ্নস্তূপে পরিণত করেছে তাঁকে। চারদিন পর 'আরাগো'

AMARBOI.COM

সানফ্রানসিসকোগামী 'নিউক্যাসল' জাহাজে তুলে দেয় এই যাত্রীদের।

লেস্ট্রেঞ্জ বেঁচে উঠলেন। অলৌকিকভাবে সানফ্রানসিসকোর এক হাসপাতালে মৃত্যুর সাথে লড়াই করে। দুর্ঘটনার দুঃস্বপ্ন থেকে মুক্ত হলেন। আর অদ্ভুত একটা চিন্তা জন্ম নিল তাঁর মাথায়। চোখের সামনে যেন দেখতে পাচ্ছেন–দুটি শিশু, একজন নাবিক, ছোট্ট একটি নৌকা, অপার অসীম নীল সমুদ্র। বেঁচে আছে, বেঁচে আছে ওরা–তার ভেতর থেকে কে যেন সাড়া দেয়। এই বিশ্বাসটাই মৃত্যুর হাত থেকে ছিনিয়ে এনেছে তাঁকে। না, এখুনি নয়। শিশুদের উদ্ধারের আগে মৃত্যু ছোঁবে না আমায়। কক্ষনো না। ক্রমবর্ধমান বিশ্বাসের দাপটে নিষ্ঠুর মৃত্যুর ছায়া ত্যাগ করল তাঁকে। হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে স্থানীয় প্যালেস হোটেলে আশ্রয় নিলেন। তারপর ভাগ্যের বিরুদ্ধে লড়ার ছক কষতে বসলেন।

সমুদ্রের নক্সা, কাগজ-পত্র, ল্যাবুক সবকিছুই গেছে হারিয়ে। জাহাজের অফিসাররাও মারা গেছে নৌকাডুবিতে। নইলে জানা যেত ঠিক কোথায় ডুবে গিয়েছিল জাহাজটা। একমাত্র উদ্ধারকারী জাহাজ 'আরাগো'র পক্ষে বলা সম্ভব ছিল কোথায়, কোন্ অক্ষাংশে, কোন্ দ্রাঘিমায় উদ্ধার করেছিল তাঁদের। 'আরাগো'র যাবার কথা ছিল 'প্যাপিটি' বন্দরে। অনেকদিন ধরে অপেক্ষা করলেন লেস্ট্রেঞ্জ 'আরাগো'র জন্য। দিন, সপ্তাহ, বছর পার হয়ে গেল, এল না।

অর্থের অভাব নেই লেস্ট্রেঞ্জের। পৃথিবীর সমস্ত বন্দরে বন্দরে বিজ্ঞাপন দিলেন তিনি। সঠিক সংবাদ দিতে পারলে দশ হাজার ডলার আর পৌঁছে দিয়ে গেলে পাবে কুড়ি হাজার ডলার পুরস্কার।

একটা খবর এল, দুটি শিশুকে উদ্ধার করা হয়েছে সমুদ্র থেকে, গিলবার্টের কাছে। কিন্তু ওরা ডিক ও এমেলিন নয়। তবু

লেস্ট্রেঞ্জের গভীর বিশ্বাস টলল না। নীল সমুদ্র থেকে ভেসে আসে ফিস্‌ফিসানি, 'আমরা বেঁচে আছি, বেঁচে আছি।'

পাঁচ বছরের মাথায় একটা দ্বি-মাস্তুল দ্রুতগামী জাহাজ ভাড়া করে ভেসে পড়লেন সমুদ্রে। আঠারো মাস ব্যর্থ অনুসন্ধান চালালেন অসংখ্য জানা-অজানা দ্বীপে। নীল লেগুনটার পাশ দিয়ে ঘুরে এলেন একবার। নৌবাহিনীর মানচিত্রে উল্লেখ রয়েছে এই দ্বীপের। আসলে ওটা ছিল পরিকল্পনাহীন ভ্রমণ। সুযোগ্য গাইডেরও অভাব ছিল। এই দেড় বছর দিনের বেলায় জলের দিকে ঝুঁকে থাকতেন জাহাজের রেলিঙ ধরে। সানফ্রানসিসকো ফিরে তিনি গেলেন বিজ্ঞাপনের এজেন্ট ওয়ানমেকারের অফিসে। নেই; কোন খবর নেই।

জাহাজডুবির আট বছর পাঁচ মাস পর। প্যালেস হোটেল। টেলিফোন বেজে উঠল লেস্ট্রেঞ্জের কামরার। রিসিভার তুলে নিলেন তিনি।

'মি. লেস্ট্রেঞ্জ?' মার্কিনী কণ্ঠস্বর।

'বলছি।'

'আমি ওয়ানমেকার।'

'কি ব্যাপার?' ধড়াস করে উঠল লেস্ট্রেঞ্জের কলজেটা।

'চলে আসুন এখানে। খবর আছে।'

পাঁচ মিনিটের মাথায় পৌঁছে গেলেন লেস্ট্রেঞ্জ কেয়ারনে স্ট্রীটে, ওয়ানমেকারের অফিসের দরজায়। বুক কাঁপছে তার। ভয় আর আশায় দরজা ঠেললেন তিনি। ডজনখানেক টাইপরাইটারের খটাখট্ শব্দে কান ঝালাপালা হয়ে গেল তাঁর। কাগজ হাতে ক্লার্করা এ-টেবিল ও-টেবিল করছে। ওয়ানমেকারকে দেখা গেল একজন টাইপিস্টের কাছে। হাতে কাগজ। কাজ বুঝিয়ে দিচ্ছে। এগিয়ে এল লেস্ট্রেঞ্জের দিকে। মুখে হাসি। খাস কামরায় ঢোকাল

AMARBOI.COM

তাঁকে।

'বলুন, কি বলবেন,' উত্তেজনায় অস্থির হয়ে পড়েছেন লেস্ট্রেঞ্জ।

'এই ঠিকানাটা,' একটুকরো কাগজ বাড়িয়ে দিল ওয়ানমেকার। 'জাহাজ ঘাটের কাছে। বলছে যে, পুরানো কোন কাগজের এক সংখ্যায় আপনার বিজ্ঞাপনটি দেখেছে সে। কিছু বলতে চায় আপনাকে। অবশ্য আমার কাছে খবরের কিছুই বলেনি সে। আপনি একবার যান। হয়তো কোন খবর আছে।'

সাইমন জে ফাউন্টেন, ৪৫ র‍্যাথরে স্ট্রীট,–।

'র‍্যাথরে স্ট্রীট কোথায় জানেন?' ঠিকানাটায় চোখ বুলানো শেষ না হতেই শুধালেন লেস্ট্রেঞ্জ।

একজন বেয়ারাকে ডাকল ওয়ানমেকার। লেস্ট্রেঞ্জকে নিয়ে যেতে বলল ওই ঠিকানায়। ওয়ানমেকারকে একটা ধন্যবাদ জানাতেও ভুলে গেলেন লেস্ট্রেঞ্জ। বেরিয়ে এলেন রাস্তায়।

র‍্যাথরে স্ট্রীটের ছোট্ট পরিচ্ছন্ন বাড়িগুলো মুখ করে আছে সমুদ্রের দিকে। বন্দরের বিচিত্র গন্ধ আর স্টীম-ক্রেনের মাল তোলা আর নামানোর শব্দে রাস্তাটা ভরপুর। ৪৫ নম্বর বাড়িটার দরজা খুলে দিল বেঁটে খাটো কর্কশ চেহারার এক বয়স্কা মহিলা।

'মি. ফাউন্টেন কি বাড়িতে আছেন?' লেস্ট্রেঞ্জ ঠিকমত কথা বলতে পারছেন না। ঢোক গিলছেন বারবার।

'আপনি?'

'বিজ্ঞাপনের ব্যাপারটা নিয়ে এসেছি।'

'ওহ্, আপনি?' মহিলাটির মুখে যেন একটু হাসি ছড়াল। লেস্ট্রেঞ্জকে সরু একটা পথ ধরে নিয়ে গেল বসবার ঘরে। 'ক্যাপ্টেন বিছানায় পড়ে আছেন। পঙ্গু। একটু অপেক্ষা করুন।'

'ধন্যবাদ,' ব্যস্তভাবে বললেন লেস্ট্রেঞ্জ, 'একটু তাড়াতাড়ি।'

বসে রইলেন লেস্ট্রেঞ্জ। আট বছর যিনি অপেক্ষা করেছেন

তাঁর জন্য কয়েক মিনিট বসে থাকা এমন কি আর। কিন্তু ভীষণ উৎকণ্ঠা বোধ করছেন তিনি। এখান থেকে হয়তো আশার আনন্দ কিংবা নিরাশার বেদনা নিয়ে বেরিয়ে যেতে হবে। ঘরের ভেতর চোখ বুলালেন। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। ম্যান্টেলপিসের ওপর বোতলবন্দী জাহাজ। অসংখ্য ঝিনুক আর শঙ্খ সাজানো। দেয়ালে টাঙানো জাহাজের ছবি কয়েকটা। প্রবীণ নাবিকের বাড়ি, ধারণা করলেন তিনি।

'আসুন, স্যার,' দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে মহিলাটি।

শোবার ঘরে ঢুকলেন লেস্ট্রেঞ্জ। কামরাটা যে একজন শয্যাশায়ী অসুস্থ লোকের বোঝা যায়। একটা শুজনির ওপর পর্বতপ্রমাণ ভুঁড়ি নিয়ে শুয়ে আছে এক লোক। গালে কালো দাড়ি। অক্ষম দুটো হাত ছড়িয়ে আছে বিছানায়। লেস্ট্রেঞ্জকে দেখল সে ঘাড় ঘুরিয়ে।

'সাইমন, ইনিই সেই ভদ্রলোক।' বলে কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেল মহিলাটি।

'একটা চেয়ার টেনে বসুন, স্যার,' নিজের অশক্ত হাত দুটো অসহায়ের মত নাড়াতে নাড়াতে বলল লোকটি। 'আপনার নাম আমি জানি না। আমার স্ত্রী বলল যে বিজ্ঞাপনের ব্যাপারটা নিয়ে এসেছেন আপনি।' লোকটির কণ্ঠস্বরও অস্পষ্ট। ভাঁজ করা [illegible]টা "সিডনি বুলেটিন" কাঁপা হাতে সে বাড়িয়ে দিল লেস্ট্রেঞ্জের দিকে। 'তিন বছরের পুরানো এটা। এর ভেতরের পাতায় দেখেছি বিজ্ঞাপনটা।'

'হ্যাঁ, ওটা আমারই দেয়া,' কাগজটা দেখে বললেন লেস্ট্রেঞ্জ।

'কি আশ্চর্য ব্যাপার দেখুন,' ক্যাপ্টেন বলল, 'কালমাত্র কাগজটা পেলাম। আলমারির মধ্যে রাখা ছিল এই তিন বছর। আমার গিন্নী পুরানো জিনিসপত্র বের করে ফেলে দিচ্ছিল। আমি কেড়ে নিলাম ওটা। পড়ার বদ অভ্যেস আছে আমার। লোভ

AMARBOI.COM

সামলাতে পারলাম না। আট মাস বিছানায় পড়ে আছি। শোথ রোগ হয়েছে। শুয়ে শুয়ে সময় কাটাচ্ছি বই পড়ে,' কথা বলে মনে হয় আনন্দ পাচ্ছে লোকটা ভাবলেন লেস্ট্রেঞ্জ। অধীর হয়ে উঠছেন তিনি আসল কথাটি শোনার জন্য। কিন্তু মুখ ফুটে বললেন না কিছু। মনোযোগী শ্রোতার মত ভাবখানা নিয়ে শুনছেন তিনি। 'তিমি শিকারী ছিলাম আমি। আমার জাহাজটার নাম ছিল 'সী-হর্স'। বছর সাতেক আগে, মার্কুইসাস্-এর পুব দিকে একটা দ্বীপে জাহাজ ভিড়াই আমরা। দ্বীপের সৈকতে আমার সাথী একটা জিনিস কুড়িয়ে পায়।'

'কি সেটা?' লেস্ট্রেঞ্জের চোখ দুটো আগ্রহে চক্ চক্ করছে।

'গিন্নী।' ক্যাপ্টেন চিৎকার করে তার স্ত্রীকে ডাকল। মহিলাটি এল। সাইমন বলল, 'চাবিটা নিয়ে এসো।'

চলে গেল মহিলা।

কিন্তু উৎকণ্ঠার চরমে পৌঁছেছেন লেস্ট্রেঞ্জ। বললেন, 'জিনিসটা দেখার আগেই একটু বলুন না কি সেটা।'

মুচকি হাসল ক্যাপ্টেন।

'দেখবেনই তো,' বলল সে।

দরজার পেছন দিকে ঝুলছে একটা ট্রাউজার। ওটার পকেট থেকে মহিলা বের করে আনল একটা চাবি। টেবিলের দেরাজ খুলে একটা বাক্স বের করে এনে দিল সাইমনের নির্দেশে।

বাক্স! উত্তেজনায় কাঁপছেন লেস্ট্রেঞ্জ। হৃৎপিণ্ডটা বাড়ি খাচ্ছে বুকের পাটাতনে অদম্য বেগে। ছোট্ট একটা কার্ডবোর্ডের বাক্স–দড়ি দিয়ে বাঁধা। ধীরে ধীরে দড়িটা খুলছে সাইমন, লেস্ট্রেঞ্জকে অসহ্য কষ্ট দিয়ে। কপালের ঘাম মুছলেন লেস্ট্রেঞ্জ হাত দিয়ে। খুলে গেল বাক্সটার ঢাকনা। বেরিয়ে পড়ল একটা ছোট্ট টি-সেট। চায়ের পট, দুধের পাত্র, ছটি কাপ প্লেট। প্রত্যেকটার ওপর নীল ফুল আঁকা।

থর থর করে কাঁপছেন লেস্ট্রেঞ্জ। অবিরল বেরিয়ে আসছে চোখের পানি। ভিজিয়ে দিচ্ছে শার্ট। হঠাৎ দু'হাতে মুখ ঢাকলেন তিনি। অবাক হয়ে গেছে ক্যাপ্টেন সাইমন ফাউন্টেন।

'কি হলো, স্যার?' ব্যগ্র কণ্ঠে শুধাল সে।

'জিনিসগুলো আমার অনেকদিনের চেনা,' ধরা গলায় বললেন লেস্ট্রেঞ্জ। ফুঁপিয়ে উঠলেন। তারপর এমনভাবে ঝুঁকে পড়লেন যেন তিনি গুঁড়িয়ে যাচ্ছেন বেদনায়। বাক্সটা তাঁর কাছে এক অজানা বার্তা বয়ে এনেছে এতদিনের ব্যর্থ অনুসন্ধানের পর। জিনিসগুলো হঠাৎ যেমন আশার আলো দেখাচ্ছে তেমনি ভয়ে আর আশঙ্কায় দুলে উঠছে তাঁর মন। রহস্যময় ওই দ্বীপে কি সত্যি ওরা আজও বেঁচে আছে? ভাবছেন লেস্ট্রেঞ্জ বেঁচে আছে, বেঁচে আছে! তাঁর ভেতর থেকে কে যেন চিৎকার করে উৎসাহ দিল।

কিছুক্ষণ পর যেন অনেকটা সাইমনেরই সান্ত্বনা শুনে শান্ত হয়ে গেলেন লেস্ট্রেঞ্জ। দু'হাতে মুখ ঢাকা অবস্থাতেই প্রশ্ন করলেন, 'কবে পেয়েছেন এগুলো।'

'সাত বছর আগে,' বলল ক্যাপ্টেন, 'দক্ষিণের এক দ্বীপে আমরা খাবার পানি ভরতে গিয়েছিলাম একবার। লেগুনের সৈকতে তালগাছের নিচে একটা যেমন-তেমন কুটির। ওটার কাছেই বাক্সটা পড়েছিল। আমার একজন লোকের নজরে পড়তেই নিয়ে এল ওটা জাহাজে।'

'মাই গড! বাক্সটা ছাড়া অন্য কেউ ছিল না সেখানে?'

'উঁহুঁ! কেউ না। এমনকি শব্দ পর্যন্ত না। কুটিরটা মনে হচ্ছিল পরিত্যক্ত। আমার অবশ্য জাহাজ থেকে নেমে নির্বাসিত লোকগুলোর খোঁজ করবার সময় হয়নি। তিমি শিকার করার ধান্দাই ছিল প্রবল।'

'দ্বীপটা কত বড়?'

'ছোট্ট কিন্তু ছিমছাম—কোন আদিবাসী নেই। শুনেছি ওটা

নিষিদ্ধ দ্বীপ। আচ্ছা, আপনি চিনতে পারছেন এগুলো কার?'

'হ্যাঁ,' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন লেস্ট্রেঞ্জ।

'আশ্চর্য! দেখুন তো,' ক্যাপ্টেনের কণ্ঠে দরদ, 'ভাগ্যিস আমি এগুলো নিয়ে এসেছিলাম সাথে। আবার দৈবের যোগাযোগ দেখুন, বিজ্ঞাপনটাও নজরে পড়ে গেল আমার। তবে তিন বছর আগে যদি পত্রিকাটা পেতাম।' একটু থেমে লেস্ট্রেঞ্জের ভাব-বিহ্বল মুখের দিকে তাকাল সে। বলল, 'সত্যিই কতই না ঘটনা ঘটে যায় এই বিচিত্র পৃথিবীতে।'

'সত্যিই তাই,' শান্ত গলায় বললেন লেস্ট্রেঞ্জ।

'হ্যাঁ, দেখুন, এগুলো তো দ্বীপেই পড়ে থাকতে পারত।'

'অথচ এখন আমার সামনে। যাকগে, দ্বীপটার অবস্থান জানা আছে আপনার?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, গিন্নী,' গলার আওয়াজ উঁচু হয়ে গেল ক্যাপ্টেনের। 'আমার লগবুকটা দাও তো।'

মহিলা ড্রয়ার খুলল। মোটা, ময়লা, কালো রঙের একটা নোট বই তুলে দিল সাইমনের হাতে। বইটির নির্দিষ্ট পৃষ্ঠা খুলে সে অক্ষাংশ-দ্রাঘিমাংশ পড়তে লাগল।

'যেদিন ওখানে গিয়েছিলাম তার বিবরণ এই যে–' খোলা লগবুকটা বাড়িয়ে দিল ক্যাপ্টেন লেস্ট্রেঞ্জের দিকে। 'অ্যাডাম নামে একজন সহকারী ছিল আমার। সে-ই কুড়িয়ে পায় একটা বাক্স। আমার লোকেরা ভেঙে ফেলে কুটিরটাকে। এক বোতল মদের বিনিময়ে আমি ওটা নিয়ে নিই অ্যাডামের কাছ থেকে। এরপর তিনবছর আটমাস আমরা সাগরেই কাটাই। বাক্সটার কথা ভুলে গিয়েছিলাম। হনলুলুতে জাহাজের মেরামত করতে এসে পড়লাম শোথ রোগে। ফিরে এলাম বাড়িতে। এই হলো কাহিনী। এরপর দেখলাম বিজ্ঞাপনটা। ভাবলাম সাড়া দেওয়া উচিত।'

সাইমনের হাত নিজের হাতে টেনে নিলেন লেস্ট্রেঞ্জ। বললেন,

'আমার পুরস্কারের কথা জানেন নিশ্চয়ই। চেক বইটা আনিনি। এক ঘণ্টার মধ্যে চেক পৌঁছে যাবে আপনার কাছে।'

'জ্বি না, স্যার,' ক্যাপ্টেন বলল, 'আগে খুঁজে দেখা হোক। ওদের খুঁজে পাওয়া গেলে কিছু গ্রহণ করতে আপত্তি করব না আমি। কিন্তু পাঁচ সেন্টের বাক্সের জন্য দশ হাজার ডলার! এভাবে ব্যবসা করি না আমি।'

'মি. ফাউন্টেন! মনে হয় জ্বর আসছে আমার। আমি এই মুহূর্তে ধন্যবাদ পর্যন্ত জানাতে পারছি না। কৃতজ্ঞ, আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ আমি।' দু'হাতে আবার মুখ ঢাকলেন লেস্ট্রেঞ্জ, 'সব ঠিক হয়ে গেলে আপনার দেনা আমি শোধ করব।' বুজে এল লেস্ট্রেঞ্জের গলা।

'ব্যস্ত হবেন না, প্লীজ,' ক্যাপ্টেন উৎকণ্ঠিত স্বরে বলল, 'আর একটা কথা,' একটু যেন ইতস্তত করছে সে।

'বলেন, আপনার সব কথা শুনব আমি।'

'অবশ্য এটা আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার, কৌতূহল দেখানো উচিত নয়,' ক্যাপ্টেন বাক্সটা গুছাচ্ছে, মাথা নিচু, 'জিজ্ঞেস করতে পারি কি, কিভাবে এখন আপনি এগুবেন?'

'এই মুহূর্তে আমি একটা জাহাজ ভাড়া করে আবার খোঁজা শুরু করব।'

'হ্যাঁ,' কিছু চিন্তা করছে সাইমন, 'সেটাই ভাল।'

'এখন বলুন, কিভাবে তাড়াতাড়ি পৌঁছাতে পারি ওখানে।'

'শিওর, এ ব্যাপারে আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারব।' সাইমন বাক্সটা দড়ি দিয়ে বাঁধতে বাঁধতে বলল, 'আপনার দরকার একটা দ্রুতগামী দ্বি-মাস্তুল জাহাজ। আর এই মুহূর্তে ও' সুলিভান ডকে ওই রকমের একটা জাহাজ-মাল খালাস করছে। গিন্নী।'

মহিলাটি সামনে এসে দাঁড়াল।

'দেখো তো, ক্যাপ্টেন স্ট্যানিস্ট্রিট বাড়িতে আছেন কিনা?' স্ত্রীর

উদ্দেশে বলল ক্যাপ্টেন, 'থাকলে, এখুনি আসতে বলো এখানে।'

চলে গেল মহিলাটি।

'মাত্র দুটো বাড়ি পরেই ও থাকে,' মোলায়েম স্বরে বলল সাইমন। 'আপনার উপযুক্ত লোক। সানফ্রানসিসকোতে দ্বি-মাস্তুল জাহাজ অনেক আছে। ক্যাপ্টেন স্ট্যানিস্ট্রিট সর্বশ্রেষ্ঠ জাহাজটির সেরা ক্যাপ্টেন। জাহাজটির নাম "রারাটোঙ্গা"। সুন্দর এবং সেরা। পালটা কেনা হয়েছে মাত্র এই বছরের শুরুতে।' একটু থেমে হাসল সাইমন, 'বিছানায় শুয়েই আপনার জন্য মাথা খাটাতে পারব আশা করি। খাবার, পানীয় আর সস্তায় মাল্লা জোগাড় হয়ে যাবে।'

বারান্দায় পায়ের শব্দ। চুপ করল সাইমন। ঘরে ঢুকল বছর তিরিশের একজন যুবক। ছ'ফুট প্রায়, কি একটু বেশিই হবে, আন্দাজ করলেন লেস্ট্রেঞ্জ। উজ্জ্বল চেহারা। চটপটে, বুদ্ধিদীপ্ত চোখ, মুখশ্রীতে স্নিগ্ধতা। লেস্ট্রেঞ্জের সাথে পরিচয় করিয়ে দিল সাইমন। প্রথম দর্শনেই লেস্ট্রেঞ্জের ভাল লেগে গেল লোকটিকে। খুশিতে প্রায় নেচে উঠলেন স্ট্যানিস্ট্রিট অভিযানের কথা শুনে।

বিস্তারিত কথাবার্তার পর লেস্ট্রেঞ্জকে সাথে করে বন্দরে নিয়ে যেতে চাইলেন তিনি। নতুন বন্ধু সাইমনের হাত জড়িয়ে ধরলেন লেস্ট্রেঞ্জ যাবার আগে। স্ট্যানিস্ট্রিটের সাথে লেস্ট্রেঞ্জ বেরিয়ে এলেন রাস্তায়। তাঁর হাতে এমেলিনের বাক্সটা।

ও'সুলিভান বন্দরে 'রারাটোঙ্গা' জাহাজটি থেকে খালাস করা হচ্ছে নারকেলের শাঁস। এ যেন নর্দামবারল্যান্ডেরই যমজ বোন। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, মজবুত।

'এই সেই জাহাজ,' স্ট্যানিস্ট্রিট হাসিমুখে দেখাচ্ছেন সব, 'পছন্দ হয়েছে তো আপনার?'

'যত্তো খরচ লাগে লাগুক। এই জাহাজ আমার চাই-ই,' বললেন লেস্ট্রেঞ্জ।

ছয়

কয়েক মাস পর।

সোনার সকাল। মাছ শিকারের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে ডিক। লেগুনের প্রতিটা কোণ তার নখদর্পণে। কোথায় গেলে বেশি মাছ পাওয়া যাবে জানা আছে ওর। সেখানে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছে সে। দ্বীপ থেকে বেশ খানিকটা দূরে জায়গাটা। পথও দুর্গম। একাই যাবে সে। এমেলিন মুখ ভার করে আছে রাত থেকে।

প্রকৃতির অকৃপণ হাতের স্পর্শে বনে, লেগুনের পানিতে রঙের ফোয়ারা। শুকনো গাছের সবুজ কচিপাতাগুলো রঙ বদল করে ফিকে সোনালি–ফিকে সোনালি থেকে নিয়েছে পীত স্ফটিকের রঙ। বড় হয়ে উড়ে গেছে কোকোর সব বাচ্চারা। বিদায় নিয়েছে কোকোর সাথী। শুধু থেকে গেছে কোকো।

কাক-ডাকা ভোরে উঠেছে এমেলিন। মনটা ভারাক্রান্ত তার। ডিককে চোখের আড়াল করতে চায় না এক মুহূর্তের তরে। মুখ থমথমে। নিঃশব্দে ডিকের জন্য নাস্তা করেছে। তৈরি করে দিয়েছে দুপুরের খাবার। ডিকের আয়োজনের সহযোগিতা করতে গম্ভীর মুখে সামনে এলেই শিস দেয় সে। তাতেও মান ভাঙছে না তার। মুচকি হাসি খেলে যাচ্ছে ডিকের মুখে। ভাল লাগে তার এমেলিনের এই অভিমান। বুকের ভেতরে কেমন এক তৃপ্তি, একটু

গর্বের ভাব জেগে ওঠে।

সবশেষে সুতোয় কিছু মুক্তো গাঁথতে বসল এমেলিন। তৈরি হচ্ছে একটা নেকলেস। একদা সে ফুলের মালা গাঁথত। একটা শামুকের মালাও তৈরি করেছিল। কিন্তু এই মুক্তোর মালার ইতিহাস ভিন্ন। লেগুনের অগভীর কোন এক অংশে ডিক আবিষ্কার করেছিল ঝিনুকদের থাকবার একটা জায়গা। একবার ভাটার সময় সে ওগুলো তুলে এনেছিল কিছুটা কৌতূহলী হয়ে। প্রথম ঝিনুকটা যখন খুলল, তার ভিতরকার থলথলে পদার্থ দেখে এত ঘৃণা হয়েছিল যে, সে হয়তো আর কখনও হাত-ই দিত না ওতে। কিন্তু আরও ভেতরে যখন নজর পড়ল চমকে উঠল সে। চকচকে একটা জিনিস। অনেকক্ষণ পরখ করল দূর থেকে। শেষে বের করল ওটাকে। একটা বড় মটরদানার দ্বিগুণ আকৃতির জিনিসটা। মুক্তোর নাম সে জানে না। আর এর দামও তার জানা নেই। তবুও তার রুক্ষ কিন্তু বাস্তববাদী মন সাড়া দিল এর সৌন্দর্যে। মুক্তোটির উজ্জ্বলতা আকৃষ্ট করল ওকে প্রচণ্ডভাবে।

এমেলিনকে উপহার দিল সে ওটা। পরের দিন হঠাৎ কোন কারণে ওই একই জায়গায় গিয়ে দেখল জল থেকে তুলে রাখার ফলে মরে গেছে ঝিনুকগুলো সূর্যের আলো লেগে। খুলে ফেলল সে ওগুলো। পাওয়া গেল আরও একটা বড় মুক্তো। সঙ্গিনীকে একটা নতুন ধরনের মালা পরাবার শখ জেগে উঠল তার মনে। প্রচণ্ড উৎসাহী হয়ে উঠল সে। প্রায় আট বুশল ঝিনুক তুলে ফেলল সে পানির নিচ থেকে। ফেলে রাখল রোদ্দুরে।

একটা বড় ও লম্বা মুক্তোর মালার জন্য অবশ্য সময় লাগল প্রচুর। বেছে বেছে বড় মুক্তোগুলো রেখে ফেলে দিল ছোটগুলো। এই বড় মুক্তোগুলোর এক একটার বাহারি সব রঙ। কোনটা একদম সাদা, কোনটা কালো কিংবা গোলাপী। আকারে কোনটা গোল, কোনটা অশ্রুবিন্দুর মত। কোনটা আবার ঢেউ খেলানো।

বড় সুঁচ দিয়ে অক্লান্ত পরিশ্রম আর প্রচণ্ড মনোযোগ দিয়ে ছেঁদা করল মুক্তোগুলোর মাঝখানে সুতো পরাবার জন্য। কিন্তু ডিক কোনদিনই জানতে পারবে না, যে অলঙ্কার খেলার ছলে সাথীকে খুশি করতে সংগ্রহ ও তৈরি করল, সভ্য জগতে তার দাম কত! রোদ ঝলমল করে উঠতেই মালা গাঁথা শেষ হয়ে গেল এমেলিনের। বড় নিষ্প্রভ দেখাচ্ছে ওকে। ভাল যাচ্ছে না শরীরটা ক'দিন ধরে। কাল সমস্ত রাত এক নিদারুণ অস্বস্তি নিয়ে কাটিয়েছে সে। ঘুমোতে পারেনি একটুও।

মাছধরা কোঁচ, বড়শি, সুতো ও বাকি জিনিসপত্র নিয়ে বনের দিকে রওয়ানা হলো ডিক। অন্যদিন এমেলিন কিছুটা এগিয়ে দেয় ওকে। আজ মুক্তোর মালা কোলে নিয়ে বসে রইল কুটিরের দরজায়। হাত নাড়ল আস্তে আস্তে ডিকের দিকে চেয়ে। যতক্ষণ না চোখের আড়াল হলো ও, তাকিয়ে রইল সে একদৃষ্টে।

বন অথবা লেগুনে পথ নির্দেশের জন্য কম্পাস বা পথ প্রদর্শকের প্রয়োজন পড়ে না ডিকের। এর প্রতিটি কোণ, প্রতিটি অংশ তার মুখস্থ। খানিকক্ষণ হাঁটার পর লেগুনের পাড়ে উপস্থিত হলো সে। আজকের জায়গাটা সুবিধের নয়। বিপদসংকুল। এখানে সামুদ্রিক ফার্ন হাঁটু পর্যন্ত বড় হয়। আজ এই উদ্ভিদগুলোর ওপর যেন ঝড় বয়ে গেছে। দলিত-মথিত হয়ে আছে। কতগুলো অজানা অচেনা উদ্ভিদ দাঁড়িয়ে আছে রাস্তা জুড়ে। জড়িয়ে যাচ্ছে পায়ে পায়ে চলতি পথে। এখানে এমন পাঁক আছে, পা ফসকালে আর নিস্তার নেই। অসহায়ভাবে তলিয়ে যাবে অতলে। উদ্ভিদগুলো আবার সোজা হয়ে দাঁড়াল। দেখলে মনে হয়, ডিক যেন বন্দী হয়ে আছে ওদের মাঝখানে।

দুপুরের খররোদ্দুর। উত্তপ্ত জলে জোয়ারের রেশ এখনও আছে এখানে। লু বাতাস। ভাপসা একটা গরম। জায়গাটা সুনসান। শুধু করুণ একঘেয়ে সুরে ডেকে চলেছে ঝিঁঝি আর অন্যান্য

পোকা।

এখানকার উদ্ভিদগুলোকে যেন একশো লোক মুড়িয়ে দিয়েছে কাস্তে দিয়ে। জোয়ারের পর এমনিই হয়। এখন আবার জাগছে সেগুলো। দাঁড়িয়ে পড়ছে একটা দুটো করে। এগুলো 'জাগ অর্কিড'। অনেকটা ঘটের আকারে বিচিত্র অর্কিড। ভিতরে অর্ধেক জল ভরা। যে কোন পাখিকে এই অর্কিড আকর্ষণ করতে পারে। কাছে এলেই মরণ ঘনিয়ে আসে বেচারার। উষ্ণ ভাপসা অঞ্চলেই ঘট অর্কিডের জন্ম হয়। এই ইন্দ্রিয়পরায়ণ উদ্ভিদগুলোর জন্য এখানকার গাছগুলোও বাড়তে পারে না। জীবনীশক্তি হারিয়ে ফেলে, দাঁড়িয়ে থাকে অর্ধমৃতের মত।

এই এলাকাটুকু পার হতে অতি সাহসী ব্যক্তিও ভয় পাবে। যে কোন মুহূর্তে ভয়ঙ্কর অর্কিডগুলো কনুই কামড়ে ধরতে পারে। সাবধানে এগুচ্ছে ডিক। ওর মত দুঃসাহসী আর কল্পনাহীন মানুষও খুব সাবধানে পার হয় এই জায়গা। প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট লাগল তার জায়গাটা পার হতে। অবশ্য ঘুরপথে যেতে পারত সে এই পথটুকু। কিন্তু সে জন্য তাকে অন্তত ছ'মাইল নৌকা বাইতে হত আরও। নির্দিষ্ট জায়গায় এসে পড়ল সে। দুপুর। সূর্য মাথার ওপর। প্রখর তেজ এখন তার। লেগুন জোয়ারের জলে ভরপুর।

এখানে লেগুন যেন একটা গামলার মত। খাঁড়ির দূরত্ব বেশি নয়। জলও নিস্তরঙ্গ। পঞ্চাশ ফ্যাদমের মত গভীরতা। পাড় থেকে মাছ ধরা যায় সহজে। নিজের জন্য আনা খাবারের ঝোলাটা রাখল সে একটা গাছের নিচে। বের করল মাছ ধরার সরঞ্জাম। একটা প্রবাল ব্যবহার করল ফাতনা হিসেবে। টোপ গাঁথল বড়শিতে। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে খানিকটা দূরে ফেলল সুতোটা। কাছেই গজিয়ে ওঠা একটা শিশু নারকেল গাছের সাথে বাঁধল সুতোর অপর প্রান্ত। তারপর বসে রইল ডিক ফাতনার দিকে চেয়ে।

তখনি হঠাৎ মনে পড়ল, তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে ঘরে।

'সাঁঝের আগেই ফিরব,' কথা দিয়েছে সে এমেলিনকে। এ সময় তার দৃষ্টি ফাতনার দিকে আর ভাবনা এমেলিনকে নিয়ে। খানিকক্ষণ পর। শক্ত প্রাণ ডিক অনুভব করল তার গাল বেয়ে নামছে অশ্রুধারা। নিঃশব্দে।

কিন্তু ডিক একজন খাঁটি শিকারী। বেড়ালের মত ধৈর্য রয়েছে তার। অক্লান্ত পরিশ্রমী সে এবং সময় সম্পর্কে উদাসীন। মাছ ধরার চেয়ে শিকারের আনন্দটাই বেশি। লেগুনে বিচিত্র সব প্রাণী থাকে। গেল বারে সে বড়শিতে গেঁথেছিল এক ভয়াল জীব। 'ক্যাট ফিস'। যদিও খাদ্য হিসেবে উপযোগী নয় কিন্তু শিকার হিসেবে চমৎকার ও অভিনব।

জোয়ারের জল কমতে শুরু করছে এখন। মাছ ধরার পক্ষে এটাই আদর্শ সময়। হাওয়া নেই। একটা কাচের চাদরের মত স্থির হয়ে আছে লেগুন। কোথাও জলে একটু টোল, কোথাও ছোট্ট একটু ঘূর্ণি।

নিশ্চল বসে আছে ডিক ফাতনার দিকে তাকিয়ে। ভাবছে সে। এমেলিনের কথা। কতকগুলো দৃশ্য ভেসে উঠছে মনের পটে। একের পর এক। দ্রুত চলে যাচ্ছে দৃশ্যগুলো। সূর্যের আলো–'শিলা-মানব'–সে আর এমেলিন। এমনি করে চাঁদের আলো–রাত–'শিলা-মানব'–এমেলিন নিচে সে উপরে–এমনি সব।

বয়ে যাচ্ছে সময়। তিনটি ঘণ্টা পার হয়ে গেছে। নির্বিকারভাবে জলে ভাসছে ফাতনাটা। জল ছাড়া লেগুনে আর কিছু আছে বলে মনে হয় না ডিকের। সমাহিত চেহারা ওর। কোন অসন্তুষ্টি বা আফসোসের চিহ্ন নেই সেখানে। পাকা মাছ শিকারী সে।

খেতে হবে। পেটের ভেতর বত্রিশ নাড়ি চেঁচাচ্ছে বেশ কিছুক্ষণ ধরে। কলাপাতা পেতে একটা সেঁকা খাবার তুলেছে মুখে, কেঁপে উঠল নারকেল গাছটা আচমকা। ঝুঁকে পড়ল গাছটা

জলের দিকে। স্থির হয়ে গেল ডিকের দেহ। সে জানে এই মুহূর্তে তার করণীয় কিছু নেই। সুতো, বড়শি, শিকার—যে যার কাজ করবে। শান্ত অবিচল ভাবে জলের দিকে তাকিয়ে থাকল সে।

হঠাৎ ঢিলে হয়ে গেল সুতো। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গেল আবার নারকেল গাছটা। টান দিল ডিক সুতো ধরে। বড়শি ছাড়া আর কিছু নেই সুতোর শেষ প্রান্তে। মন খারাপ হলো না ওর তবু। আপনমনে হাসল সে খানিকক্ষণ। কোন আফসোস নেই। টোপ গাঁথল আবার বড়শিতে। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ছুঁড়ে দিল জলে সুতো আর বড়শি। আবার টোপ গিলবে জলের প্রাণীটি। নিশ্চিত সে।

সময় অনেক বয়ে গেছে। পশ্চিমে পাড়ি দিয়েছে সূর্য। সাঁঝের আগে ঘরে ফেরার কথা মনেই নেই ডিকের।

হঠাৎ বনের ভেতর থেকে, গাছ-গাছালির মাঝ দিয়ে চিৎকার ভেসে এল একটা। এমেলিন! প্রায় আর্তনাদের মত মনে হলো ডাকটা ওর কানে। আবার! ভয়ার্ত স্বরে ডাকছে এমেলিন, 'ডিক!'

হাতের সুতো ফেলে দিয়ে চমকে পেছন ফিরে তাকাল ডিক। কই, কাউকেই তো দেখা যাচ্ছে না। দৌড়ে বনের ভিতর ঢুকল সে। উঁহুঁ, নেই তো এমেলিন। এ গাছ থেকে ও গাছ ছুটে বেড়াল ও খানিকক্ষণ। এবার নাম ধরে চিৎকার শুরু করে দিল। সাড়া দিল না কেউ। শুধু প্রতিধ্বনি শোনা গেল ডিকের চিৎকারের। আবার ফিরে এল সে আগের জায়গায়। ভুল শুনল না তো। ভাবল সে। উঁহুঁ, স্পষ্ট শুনেছে সে এমেলিনের কণ্ঠস্বর। তাহলে? আবার ঘুরে ফিরে বনের ভেতরটা খুঁজল আঁতিপাঁতি করে। নাহ্, নেই।

সূর্য প্রায় ডুবু ডুবু। নিজের ওপরই জিদ হলো ডিকের। অনেক আগেই ফিরে যাওয়া উচিত ছিল তার। কিন্তু ওই মাছ ধরার নেশাটা। ওটা মাঝে মাঝে সম্মোহিত করে ফেলে ওকে। তখন সময় জ্ঞান হারিয়ে ফেলে সে। ফিরে এল সে নারকেল গাছটার কাছে। দাঁতে দাঁত চেপে ঠোঁট কেটে জিদ মেটাল। টানাটানি করে

সুতো টেনে নিল জল থেকে। দ্রুত হাতে গুছিয়ে নিল মাছ ধরার সরঞ্জাম। বাড়ি ফেরার পথ ধরল কোঁচ হাতে।

সেই বিপদসংকুল জায়গাটায় এসে পড়ল। আচমকা শির-শির করে উঠল তার সমস্ত শরীর। মেরুদণ্ড বেয়ে নেমে এল হিমেল স্রোত। তবে কি–

দুশ্চিন্তায় মাথাটা ঘুরে উঠল ডিকের বোঁ করে। সত্যি সত্যিই কি এমেলিনের কোন বিপদ ঘটেছে? সন্ধ্যাবেলা। ঘনায়মান আঁধারে হঠাৎ ডিকের মনে হলো আগাছাগুলো যেন বেশি ঘন হয়ে জেগে উঠেছে ইতোমধ্যে। সাপের মত জড়িয়ে ধরতে চাইছে যেন লতাগুলো। ধড়াস করে লাফিয়ে উঠল তার কলজেটা। সাবধান হয়ে গেল সে। খুব সতর্কতার সাথে পা রাখছে ডিক। এলোমেলো হলেই প্রাণ যাবে। সময় বয়ে যাচ্ছে। নামছে আঁধার। ওদিকে এমেলিন! হায় হায় করে উঠল ডিকের বুকের ভেতর। পাগলের মত এগুতে গিয়েই ফেঁসে গেল সে। হারিয়ে ফেলল পথ। ঘুটঘুটে আঁধার। কি যেন জড়িয়ে ধরল ওকে আষ্টেপৃষ্ঠে। সাপের মত ঠাণ্ডা লতাগুলো স্পর্শ করল ওকে। প্রথমে নরমভাবে, যেন এমেলিন আদর করছে। তারপর আচমকাই আকাশ ভেঙে পড়ল ডিকের মাথায়।

জ্ঞান ফিরতে অবাক হলো সে। ভাসছে সে যেন শূন্যে! মারা গিয়েছিল তো সে! কে বাঁচাল ওকে? মনের গহন গভীর থেকে ডেকে উঠেছিল যেন এমেলিন। সেই ভয়ার্ত, তীক্ষ্ণ 'ডিক' ডাকটাই যেন বাঁচিয়ে দিল ওকে। গা ঝাড়া দিল ডিক। আরে! একেবারে মুক্ত মনে হচ্ছে! এখনও বুঝতে পারছে না বেঁচে থাকার কারণটা। মাথা ঝাড়া দিল দু'বার। তাকাল ভালভাবে চারপাশটায়। হেসে ফেলল সে বোকার মত। প্রকৃতিই বাঁচিয়ে দিয়েছে ওকে। ভেসে আছে সে পানির ওপর। তাই-ই এতক্ষণ শূন্যে ভাসছে, মনে

হচ্ছিল তার। জোয়ার! হঠাৎ জোয়ার এসে রেহাই দিয়েছে ওকে ওই জটিল উদ্ভিদের হাত থেকে। জোয়ারের সময় নেতিয়ে পড়ে ওগুলো, যেন গলা টিপে দিয়েছে কেউ। বেঁচে গেছে সে। মনে পড়ল এমেলিনের কথা। দ্রুত চার হাত পা চালাল। পায়ে হাঁটার এতদিনের চেনা পথ অচেনা হয়ে গেছে। কিন্তু তীক্ষ্ণ শিকারীর অনুভূতি ওকে যেন দিক নির্দেশ করে দিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই উদ্‌ভ্রান্ত ভাবটা কাটিয়ে উঠল সে। ঘণ্টাখানেক পর খুঁজে পেল দিকটা। ভুল করে সে অনেক ডানে চলে গিয়েছিল। নিশ্চিন্ত মনে তরতর করে এগিয়ে চলল ডিক। যেন একটা বুনো পশু মুক্তি পেয়েছে ফাঁদ থেকে। পালাচ্ছে। চাঁদের আলো ফুটেছে। সেই আলোতে, সাগর তরঙ্গের শব্দকে অবলম্বন করে দ্রুত কুটিরের দিকে সাঁতরে চলল সে।

লেগুনের তীরবর্তী তৃণ অঞ্চলে ডিক যখন পৌঁছুল, চাঁদ তখন আকাশে হাসছে। তার আলোয় কিছু স্লেট রং মেঘের টুকরো দেখা গেল ভাসছে আকাশে পাখির পালকের মত। গাছের নিচে তাদের কুটিরটা নজরে পড়ল তার। ঘাস-ছাওয়া জায়গাটার মাঝখান দিয়ে, তীরের মত ছুটল সে।

এতদিন ধরে, প্রায় একটা প্রথার মতই, এমেলিন কুটিরের দরজায় দাঁড়িয়ে ডিকের আসার পথ চেয়ে থাকত। কিন্তু আজ ও নেই ওখানে। কুটিরে ঢুকল ডিক পাগলের মত অস্থির হয়ে। নেই। ভেতরেও নেই এমেলিন। কুটিরের প্রতিটা অংশ খুঁজল তন্ন তন্ন করে। এবার আশপাশটা খুঁজল। নাহ্। উবে গেছে সে যেন কর্পূরের মত। বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ডিক। একটা অজানা আশঙ্কায় ছেয়ে গেল তার মন। কিছু আর ভাবতে পারছে না সে এই মুহূর্তে। বুকের ভেতরটা খালি হয়ে গেছে তার। ঝাঁ ঝাঁ করছে কানের দু'পাশ।

বাটনের সেই ভয়ঙ্কর মৃত্যুর পর নতুন একটা উপসর্গ দেখা দিয়েছিল এমেলিনের। মাঝে মাঝে দেখা দিত ওটা। ভীষণ কষ্ট হত মাথার ভেতর। যন্ত্রণা যেদিন বাড়ত, চলে যেত বনের ভেতর। নিজেকে লুকিয়ে রাখত গাছের আড়ালে। এই অবস্থায় বনের মাঝে তাকে খুঁজে বেড়াত ডিক। চিৎকার করে ডাকত নাম ধরে। খুব ক্ষীণভাবে হলেও সাড়া দিত এমেলিন। খানিকক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর তাকে আবিষ্কার করত ডিক কোন গাছের নিচে বা ঝোপের আড়ালে। অসহ্য যন্ত্রণায় মাথা চেপে বসে আছে এমেলিন, দেখত ডিক।

এই মুহূর্তে কথাটা মনে পড়াতে বনের ধার দিয়ে আবার এমেলিনের নাম ধরে ডাকতে ডাকতে ছুটে চলল ডিক। উত্তর শুনবার জন্য অপেক্ষা করল এক একবার দাঁড়িয়ে। না, কোন সাড়া নেই। ঘুটঘুটে আঁধার। লক্ষ-কোটি ঝিঁঝির একটানা ডাক থেমে গেল হঠাৎ। ওরাও যেন কান পেতে আছে এমেলিনের জবাব শোনার জন্য। সাড়া না পেয়ে আবার ডাকতে শুরু করল প্রবল উদ্যমে। ঘণ্টাখানেক এইভাবে হাঁটল ডিক। শেষে রাজ্যের ক্লান্তি ভর করল তার ওপর। নক্ষত্রের আলোয় কোন রকমে হোঁচট খেতে খেতে ফিরে এল সে ডেরায়। অন্ধকারে বসে পড়ল কুটিরের দরজায়। প্রচণ্ডভাবে হাঁপাচ্ছে। তার ক্লান্তি অবসাদের সাথে জড়িয়ে আছে গভীর দুঃখ। এমেলিনের জন্য। হাহাকার করে উঠল ওর বুকের ভেতরটা। হাঁটুর ওপর মাথা রেখে অসহায়ভাবে বসে রইল। কি বিপদে পড়েছে এমেলিন, সে জানে না। নিশ্চয়ই বিপদে পড়েই ডেকেছিল ডিককে। আর সে কি-না মাছ ধরা নিয়ে ব্যস্ত ছিল নিশ্চিন্ত মনে। নিজের এই দোষের কথা ভেবে পাগল হয়ে গেল যেন ডিক। সোজা হয়ে বসে ক্ষোভে, শোকে, আক্রোশে দু'হাতে মাটির ওপর আঘাত করতে শুরু করল। তারপরই উঠে দাঁড়াল তড়াক করে। দৌড়ে গেল ডিঙিটার দিকে।

লাফিয়ে পড়ল নৌকায়। ক্ষিপ্র হাতে তুলে নিল দাঁড়। প্রচণ্ড শক্তিতে দাঁড় বেয়ে চলে এল খাঁড়ির কাছে। ব্যাপারটা তার পাগলামিরই নামান্তর। কারণ, এমেলিন কখনোই একা ওখানে যেতে পারে না।

চাঁদ ঢাকা পড়েছে একটুকরো মেঘের আড়ালে। আকাশে শুধু নক্ষত্রের ওড়না। সমুদ্রের ঢেউয়ের শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। ডিঙির ওপর দাঁড়িয়ে আছে ডিক। চোখে মুখে ঝাপটা মারছে রাত্রির বাতাস। খাঁড়িতে আছড়ে পড়া ঢেউয়ের সাদা ফেনা। এমন একটা ভয়ঙ্কর অপার্থিব নির্বিকার জগতের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বেদনায় মোচড় দিয়ে উঠল ডিকের মন। ওর নিষ্ঠুর দুটো চোখ বেয়ে নেমে এল নিঃশব্দ অশ্রুধারা।

ঘরে ফিরে এল ডিক অনেকক্ষণ খাঁড়িতে কাটিয়ে। না, ফেরেনি এখনও এমেলিন। একটা মুক্তোর মালা পড়ে আছে দরজার কাছে। আজ সকালে এটা ছিল এমেলিনের হাতে। তুলে নিল ওটা। তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ ধরে মালাটার দিকে। একসময় ক্লান্ত, শ্রান্ত, বিধ্বস্ত ডিক শুয়ে পড়ল। উপুড় হয়ে দু'হাতের ওপর মাথা রেখে কুটিরের দরজার কাছে।

•

কাক ডাকা ভোর।

দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে গেল ডিকের। চমকে উঠল সে। এখানে কেন? 'শিলা-মানব' মূর্তিটার পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ে আছে। কিন্তু রাতে তো কুটিরেই শুয়েছিল সে। নিশ্চয় এমেলিনকে খুঁজতে বেরিয়েছিল আবার। নিশি-পাওয়া লোকের মতই খুঁজে বেড়িয়েছে পুরো লেগুনে। শেষে লুটিয়ে পড়েছে এখানে। সূর্য উঠছে। নানান রঙ ধরা দিচ্ছে বনে তার ঝলমলে আলোয়। স্খলিত পায়ে হেঁটে এল সে কুটিরে। নিঃশেষ হয়ে গেছে ডিক। চেহারায় বুনো আকর্ষণটা নেই আর। ধপাস করে বসে পড়ল কুটিরের

দরজায়। বসেই রইল মাথা নিচু করে। যখন মাথা তুলল, দেখতে পেল গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে ঘাস-ছাওয়া জায়গার মাঝখান দিয়ে আসছে সে। এমেলিন।

কয়েক মুহূর্তের জন্য জমে গেল ডিক। চেয়ে রইল আগুয়ান এমেলিনের দিকে পলকহীন চোখে। তারপর লাফিয়ে উঠল তড়াক করে। ছুটল ওর দিকে।

এমেলিনকে দেখাচ্ছে রক্তহীন ফ্যাকাসে। চোখে-মুখে একটা বিভ্রান্ত, হতবুদ্ধির ভাব। তার হাতে ওটা কি? শরীরে যে একটুকরো কাপড় স্কার্ফের মত জড়াত, তাতে কিছু জড়িয়ে নিয়ে আসছে সে টলমল পায়ে। মনে হলো ডিককে দেখে হাঁটার গতি বাড়ানোর চেষ্টা করেছিল কিন্তু ক্লান্তিতে এলোমেলো হয়ে গেল তার পদক্ষেপগুলো। পিছিয়েই রইল। কাছে চলে এল ডিক। স্কার্ফে জড়ানো বস্তুটি তুলে দিল এমেলিন ওর হাতে। মুখে বোকার মত এক টুকরো নিঃশব্দ হাসি। ডিকের বুকের কাছে চাপ লেগে নড়ে চড়ে উঠল জিনিসটা। চিৎকার জুড়ে দিল তারস্বরে মাংসপিণ্ডটা। চিৎকারটা যেন একটা বেড়াল ছানার মিউ-উউ-ডাকের মত। তাড়াতাড়ি ডিক বস্তুটি ফিরিয়ে দিল এমেলিনের কাছে।

এমেলিন খুব সাবধানে সরিয়ে দিল স্কার্ফটা। ইটের মত লাল রঙ একটা মুখ। এইটুকুন। কুঁচকে আছে চামড়া। দুটো উজ্জ্বল ডাগর চোখ ছোট্ট মুখটিতে। থোকা থোকা কালো চুল মাথায়। চোখ দুটো খোলা। একরাশ বিস্ময় ঝরে পড়ছে ও দুটিতে। হঠাৎ বন্ধ করল সে চোখ! দু'বার হাঁচল মুখ তুলে।

আলতো করে ওর মুখ ঢেকে দিল আবার এমেলিন।

'কোথায় পেলে এটা?' কৌতূহলে আর খুশিতে ঝিকমিক করছে ডিকের মুখ।

'বনের মধ্যে।' বলল এমেলিন ক্লান্তস্বরে।

বিস্ময়ে বোবা ডিক এমেলিনকে কুটিরে নিয়ে এল একহাতে জড়িয়ে ধরে।

'তুমি চলে গেলে। এক সময় আমার শরীর খুব খারাপ লাগতে লাগল। পরশু রাত থেকেই এমন হচ্ছিল। আমি যন্ত্রণায় কাতর হয়ে চলে গেলাম বনে। ব্যথায় কাতরে উঠলাম। ডাকলাম তোমাকে। তুমি এলে না। আমি চোখ বুজে পড়ে থাকলাম। তারপর আর কিছু মনে নেই আমার। ঘুম ভাঙতে দেখি এইটা আমার কাছে। কাঁদছে।'

'এটা তো একটা বাচ্চা।' ডিক তখনও ঘোরে আছে।

'হ্যাঁ।' এমেলিন হাসল যেন অনেক কষ্টে। অবাক হয়ে চেয়ে থাকতে থাকতেই মিসেস জেমসের শিশুর কথা ওদের হারিয়ে যাওয়া স্মৃতিতে আবার ভেসে উঠল আচমকা। জিনিসটা কী বুঝাবার জন্যই হয়তো পুরানো স্মৃতি সাহায্য করল ওদের। অবাক বিস্ময়ে ওরা জীবনের এই রহস্যময়, কাব্যিক ও অপূর্ব সুন্দর জিনিসটির দিকে তাকিয়ে থাকল অপলক।

অনেকক্ষণ পর হাসল ওরা পরস্পরের দিকে চেয়ে। হাসতে হাসতে ডিক টান দিল এমেলিনকে। বুকে জড়িয়ে নিল ওকে।

'আমার অনেক কষ্ট হয়েছে,' কেঁদে ফেলে বলল এমেলিন।

'তোমাকে অনেক খুঁজেছি,' বলে আরও জোরে বুকে চেপে ধরল ওকে ডিক।

'এটা আমাদের!' বলল এমেলিন।

হাসতে শুরু করল ডিক অকারণেই। হাসতে হাসতে স্কার্ফটা সরিয়ে দেখল বাচ্চাটিকে। হাসির তোড় বাড়ল। সে হাসি সংক্রমিত হলো এমেলিনের মাঝেও। হাসছে সে-ও। চোখে অশ্রু।

'জানো,' হাসতে হাসতে বলল এমেলিন, 'ওর সঙ্গে না, ইয়া বড়–,' হাত বাড়িয়ে আকার দেখাল সে, '–একটা দড়ির মত কি যেন জড়ানো ছিল।' এমেলিন কথাটা এমনভাবে বলল যেন একটা

পার্সেল সম্পর্কে কথা বলছে। বলে আবার হাসল। হাসি থামতে হাঁপাতে লাগল সে ক্লান্তিতে।

'ওকে দাও তো। দেখি একটু,' অনুরোধ জানাল ডিক।

'না, না।' এমেলিন সতর্ক হয়ে ওঠে, 'একাই থাকুক।'

দু'হাতে তুলে নিল বাচ্চাটিকে। খুব আস্তে আস্তে শিশুটিকে দোলা দিতে লাগল এমেলিন নিজের ব্যথা-বেদনা ভুলে গিয়ে। সম্পূর্ণ আত্মহারা হয়ে গেছে ওরা। শুধু অবাক চোখে চেয়ে আছে এই আবিষ্কারের দিকে। এই অবস্থায় কোন চিকিৎসক এমেলিনের সন্তান প্রসবের কথা চিন্তা করলে হয়তো ভয়ে কেঁপে উঠবে। কিন্তু দ্বীপে কোন ডাক্তার নেই। তাই প্রকৃতি নিজের হাতে সময়-কাল ঠিক রেখে সব কিছু করছে সুচারুভাবে।

অনেকক্ষণ বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে বাচ্চাটির দিকে তাকিয়ে থাকার পর উঠে দাঁড়াল ডিক। কিছুই খায়নি সে গতকাল থেকে। বিধ্বস্ত এমেলিনেরও একই অবস্থা। দুজনই ক্লান্ত, অবসন্ন, ক্ষুধার্ত। আগুন ধরাল ডিক। কিছু খাবার সেঁকল। গতকালের বাসি মাছ আছে। কলা আছে কুটিরে। বড় বড় দুটো পাতায় খাবার জিনিস সাজাল ডিক। এমেলিনকে জোর করে খাওয়াল আগে।

ওদের খাবার শেষ হবার আগেই পুঁটলির মধ্যে রাখা বাচ্চাটি জুড়ে দিল চিৎকার। বোধহয় খাবারের গন্ধ পেয়ে, ওরা ধারণা করল। এমেলিন স্কার্ফ খুলে বের করল ওকে। ক্ষুধার্ত মনে হচ্ছে বাচ্চাটিকে। একবার হাঁ করছে মুখ, আবার বন্ধ করছে। খানিক পর পরই চোখ খুলে চেঁচাচ্ছে তারস্বরে। ফট্ করে বুদ্ধিটা খেলে গেল এমেলিনের মাথায়। একটা আঙুল ওর ঠোঁটের কাছে নিয়ে গেল সে। ওর আঙুলটাকে প্রায় টেনে নিল বাচ্চাটার উষ্ণ ঠোঁট। চুষতে শুরু করল। থেমে গেল কান্না। ডিক ফুর্তিতে এক পাক ঘুরে গেল। হাততালি দিল খানিকক্ষণ। অসহায় এমেলিন কান্নাভরা চোখে তাকাল ডিকের দিকে। তার দৃষ্টিতে খুশির ছোঁয়া।

হাঁটুতে ভর দিয়ে বসল ডিক। একটা কলার খোসা খুলে তার থেকে একট টুকরো ভেঙে হাতে তুলে দিল এমেলিনের। চুষবার চেষ্টা করল বাচ্চাটা। খানিক পরেই মুখে বুড়বুড়ি তুলে চেঁচাতে শুরু করল ফের।

'দাঁড়াও, দেখছি কি করা যায়।' বলে ডিক ছুটল ঘরের ভেতর। একটা ডাব নিয়ে এল। কাটল সেটা। একটু ফুটো করে ডাবের জল বাচ্চাটির মুখে দিল। খানিকটা খেয়ে ফেলল বাচ্চাটি। পরক্ষণেই ভীষণভাবে বমি করতে শুরু করল। বেড়ে গেল চিৎকার। প্রচণ্ড ভয়ে এমেলিনের মুখ শুকিয়ে গেল। কি করবে ভেবে না পেয়ে জড়িয়ে ধরল বাচ্চাটির নরম দেহ নিজের বুকে।

হঠাৎ! একটা স্পর্শে সমস্ত শরীর শিরশিরিয়ে উঠল তার। বাচ্চাটির মুখ ছুঁয়েছে এমেলিনের স্তনের বোঁটা। চিড়িক মেরে উঠল ওর মাথাটা। জোঁকের মত সেঁটে গেল বাচ্চাটা মায়ের বুকে।

ওরা কাঁদছে খুশিতে।

দুপুরে, সূর্যের প্রখর উত্তাপ। এ সময় খাঁড়ির পানি গরম থাকে। ওরা তখন শিশুটিকে নিয়ে যায় ওখানে। এক টুকরো কাপড় দিয়ে ঘষে ঘষে ওকে স্নান করায় এমেলিন। প্রথম প্রথম চেঁচাত বাচ্চাটি উচ্চস্বরে। এখন আর স্নান করার সময় কান্নাকাটি করে না। এমেলিন শুইয়ে দেয় ওকে পায়ের ওপর অদ্ভুত কায়দায়। আকাশের দিকে চিৎ হয়ে দুর্দান্তভাবে হাত পা ছোঁড়ে জলে। স্নান করা তার কাছে মজার একটা ব্যাপার এখন। জলের মধ্যে ওকে উপুড় করে দেয় এমেলিন। দু'হাতে ধরে থাকে পেটের নিচে। দুষ্টু শিশু জলে মাথা ডুবিয়ে বুড়বুড়ি কাটে, হাসে খিলখিলিয়ে আর পানির নিচের প্রবালের বিচিত্র বর্ণ আর আকৃতির দিকে চেয়ে থাকে গভীর দার্শনিক দৃষ্টি নিয়ে।

জলে গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে মজা দেখে ডিক। নিজেকে সে এই

বাচ্চাটির মালিকানা-স্বত্বের একজন অংশীদার হিসেবে ভাবে। আসলেও যে সে তাই তা-তো তার অজানা। এই শিশুটির আগমন-রহস্য আজও তাদের দু'জনের কাছেই না-জানা বিস্ময়ে ভরা। হপ্তাখানেক আগেও সে আর এমেলিন ছিল একা। হঠাৎ কোথা থেকে হাজির হয়েছে এই নতুন সাথী। অন্যান্য প্রাকৃতিক যোগের মত এটাকেও একটা শুভযোগ হিসেবে আন্দাজ করে নিয়েছে ওরা।

শিশুটির শরীর পূর্ণতা পাচ্ছে দিনে দিনে। ওর মাথা ভর্তি চুল। খুদে খুদে আঙুলে ছোট্ট হাতে ওদের জড়িয়ে ধরে প্রতিদিন বড় হচ্ছে সে একটু একটু করে। সাথে সাথে প্রকাশ পাচ্ছে নানান পরিবর্তন।

এক সপ্তাহের মধ্যে মিলিয়ে গেল শিশুটির বিশ্রী রূপ। ওর মুখটা ছিল যেন ইটে খোদাই করা একটা বানর। ধীরে ধীরে তার বদলে ফুটে উঠল এক সুখী স্বাস্থ্যবান মুখশ্রী। বড় বড় চোখ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে সে এখন। সব জিনিসে কৌতূহল তার। মাঝে মাঝে এমন ভাবে হেসে উঠে যেন কোন মজার কথা বলেছে তাকে কেউ। আস্তে আস্তে বিদায় নিল তার কালো চুল। দাঁত ওঠেনি এখনও। আজ-কাল বিচিত্র শব্দ করে সে চিৎ হয়ে শুয়ে, লাথি ছোঁড়ে। দু'হাতের আঙুলগুলো মুখে পুরে চুষতে চুষতে হেসে ওঠে খিলখিলিয়ে। পা তুলে হাত দিয়ে পায়ের পাতা ধরে থাকে। সত্যি কথা বলতে কি, পৃথিবীতে প্রতি সেকেন্ডে যেসব সন্তানের জন্ম হচ্ছে, তাদেরই একজন সে।

'ওর নাম কি রাখবে?'

একদিন ঘাসের ওপর গাছের ছায়ায় হামাগুড়ি দিতে থাকা অবস্থায় বাচ্চাটির দিকে তাকিয়ে এমেলিনকে প্রশ্ন করল ডিক।

'হানা।' উত্তর দিতে একটুও সময় নিল না এমেলিন। অনেক দিন ধরেই ভাবছে সে এই নামটি। যতবার ভেবেছে তার অতীত

স্মৃতিতে ভেসে এসেছে এই একটি নামই। ছেলেবেলায় ওর এক প্রতিবেশীর বাচ্চার নাম ছিল এটি। এমেলিন জোর করে তাকে কোলে তুলে নেয়ায় বকা খেয়েছে অনেক। নামটা ভাল লাগে তার। এই নির্জন দ্বীপে অনেক দিন থাকায় অন্য কোন নাম তার মগজে নেই। অবশ্য এমেলিনের স্মৃতির ওই 'হানা' নামধারী শিশুটিও ছিল ছেলে।

ডিক এমেলিনের এই সংসারের আরেকজন স্থায়ী সদস্য কোকো-র কিন্তু এই নবজাতকের উপর গভীর আগ্রহ। বাচ্চাটির পাশে পাশে সে চলে লাফিয়ে লাফিয়ে। ঘাড় বেঁকিয়ে দেখে হঠাৎ থেমে। হানা হামাগুড়ি দিয়ে ছোটে কোকোর পেছনে। উদ্দেশ্য কোকোর লেজ ধরে টানা।

কয়েক মাসের মধ্যেই শরীর এত মজবুত আর শক্ত সামর্থ্য হয়ে উঠেছে যে সে তার বাবাকে খেলার পার্টনার করে। এক এক সময় দেখা যায় হানা, তার বাবা-মা—তিনটি মানব-মানবী খেলছে শিশুর মত। আর কোকো—তাদের বাহবা দেবার জন্য চক্কর কাটছে মাথার উপর।

কিন্তু কোন কোন সময় এমেলিন যেন কেমন হয়ে যায়। বসে বসে সে তার সন্তানের কথা ভাবতে থাকে। এসময় তার চোখে মুখে ফুটে ওঠে একটা অস্বস্তিকর ভাবনার ছায়া। দৃষ্টি চলে যায় যেন দূরে, বহু দূরে। পুরানো দিনের দুর্ঘটনার দৃশ্য চোখের সামনে ভাসছে তার। প্রকৃতির উজ্জ্বল সুখী হাসিমুখের আড়ালে উঁকি দেয় দুঃস্বপ্নের দিনগুলো। না, এ-সুখ এ-আনন্দ কিছুতেই হারাতে চায় না এমেলিন।

একটি মানব শিশুর জন্মের মত অপূর্ব-সুন্দর জিনিস আর কি হতে পারে। এখানে, সমুদ্রের হৃদয়ের ভেতর, সূর্যের আলো, বাতাসে আন্দোলিত গাছ, বিশাল নীল আকাশের তোরণের নিচে এই দ্বীপে নিষ্কলঙ্ক চিন্তা নিয়ে ওরা দু'জন এতটুকু লজ্জিত না হয়ে

শুধু একজনের কথা আলোচনা করে। আর আলোচিত বস্তুটি তখন ঘাসের ওপর হামাগুড়ি দিয়ে চেষ্টা করে কোকোর লেজ ধরতে।

দ্বীপের এই অসীম একাকীত্ব, তাদের জীবনের অজ্ঞতা, সরলতা, এবং এই নতুন সৌন্দর্য আবার সাথে সাথে ভুলিয়ে দিয়েছে দু'বছর আগেকার মৃত্যুর অলৌকিক ভয়ঙ্কর ঘটনা। মুছে গেছে মৃত মানুষের কথা ওদের মন থেকে। মুগ্ধ বিস্ময়ে মোহিত হয়ে দেখছে ওরা নবজাতকের খেলা।

হানা খুব দুষ্টু, সারাদিন ছটফট করে। তার মাথায় কালো চুল ঝরে গিয়ে প্রথমে পাকা গমের মত হলুদ পরে সোনা-হলদে রঙের চুলে ভরে গেছে। একদিন, খুব অস্বস্তি নিয়ে হানা ছোট্ট বুড়ো আঙুল চিবোচ্ছিল, অবাক এমেলিন এগিয়ে গেল, ঠোঁট ফাঁক করল ওর। মাড়ির ভেতর থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসছে সাদা চালের মত একটু অংশ। হানার প্রথম দাঁত। সে এখন কলা ও ডাবের পানি খেতে পারে। ওর বাবা-মা ওকে মাছ পর্যন্ত খাওয়ায়। এই দৃশ্য দেখলে যে কোন ডাক্তার শিউরে উঠত। কিন্তু হানা এসব খেয়েও সতেজ আর শক্তিশালী হয়ে উঠছে ক্রমশ। এমেলিন তার স্বাভাবিক জ্ঞান নিয়ে ওকে সম্পূর্ণ নগ্ন রাখে। অক্সিজেনের পরিপূর্ণ স্নিগ্ধতা আর সূর্যের আলো গায়ে মেখে উজ্জ্বল আর বলিষ্ঠ হয়ে উঠছে সে। ওর বগলে দু'হাত রেখে খাঁড়ির গভীর জলে ছেড়ে দেয় সে হানাকে। দু'পা ছুঁড়ে দাপাদাপি করে হানা জলের ভেতর। হীরের মত উজ্জ্বল লেগুনের জল ওর পায়ের আঘাতে আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। আনন্দে চিৎকার করে হানা। হেসে ওঠে খিল খিল করে।

এরপর ডিক ও এমেলিন এক নতুন সত্তার উপস্থিতি অনুভব করল হানার ভেতর। ওর মাঝে বুদ্ধির বিকাশ হচ্ছে। ছোট একটা মানুষের ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠছে। নিজের প্রতি পক্ষপাতমূলক আচরণ, তার ভাল লাগা-মন্দ লাগা সম্পর্কে জানান দিচ্ছে হানা।

মায়ের চেয়ে বাপকেই তার পছন্দ বেশি। মায়ের কাছ থেকে বিশেষ প্রয়োজনটুকু কেড়ে নিয়ে ডিকের দিকে ছুটবে সে। কোকোকে তার ভীষণ পছন্দ। ওর বন্ধু। কিন্তু কোকোর এক বন্ধু যখন তার তিনটে লাল পালকের সোনালি লেজ নিয়ে কৌতূহলী চোখে ওর দিকে এগিয়ে এল বন্ধুত্বের জন্য, পছন্দ হলো না তাকে হানার। তীক্ষ্ণ এক চিৎকার দিল সে। ফুড়ুৎ করে উড়ে পালাল পাখিটা।

হানার আরেক পছন্দ ফুল। অবশ্য যে কোন উজ্জ্বল জিনিসেই তার প্রবল আকর্ষণ। ডিঙিতে চড়ে লেগুনে যেতে যেতে সে চিৎকার করবে, হাসবে। ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইবে জলে, যেখানে উঁকি দিচ্ছে অজস্র উজ্জ্বল রঙিন প্রবাল।

একদিন ওরা ঘুরে বেড়াচ্ছিল লেগুনে। মৌকো বাইতে বাইতে থেমে গেল ডিক হঠাৎ। এমেলিন তার কোলে নাচাচ্ছে হানাকে। ঠিক সেই মুহূর্তে হানা ডেকে ওঠে, 'আর্ব-বু-বুউ!'

'আরে! কি বলল ও?' অবাক ডিক যেন সঙ্গীতের মূর্ছনা শুনেছে। এমেলিনের দিকে চেয়ে আছে ও বিস্ময়ে হতবাক হয়ে। তারপর থাবা দিয়ে তুলে নিল হানাকে নিজের কাছে। জড়িয়ে ধরল বুকে। চুমুতে চুমুতে ভরে দিল ওর চোখ, মুখ, ঠোঁট।

খুশিতে হাততালি দিয়ে আবার ডেকে ওঠে হানা, 'ডি-ই-ক।'

বরফের মত জমে গেছে ডিক। চেয়ে আছে হানার দিকে রাজ্যের বিস্ময় নিয়ে।

রাত। আকাশে চাঁদ। জ্যোৎস্নার কোমল আলো ছুঁয়েছে দ্বীপটিকে এইমাত্র। লেগুন শান্ত। বাতাসে সুগন্ধ। ওরাও খুশি। হঠাৎ ঢেকে দিল বিশাল কালো একটা চাদর সুন্দর চাঁদটাকে। ভয়ঙ্কর দ্রুততায়। সাগরের দূর সীমা থেকে ভেসে এল একটা ক্রুদ্ধ গর্জন হঠাৎ। লেগুনের জল হয়ে উঠল উত্তাল। এক নিমেষে দ্বীপের

নারকেল গাছগুলোকে শুইয়ে দিল ঝড়ো বাতাস।

কুটিরের ভেতর থর থর করে কাঁপছে এমেলিন বাচ্চা হানাকে বুকে নিয়ে। ডিক চুপ। ঝড় আসছে। এই দ্বীপে ঝড় আগেও ঝাপটা মেরেছে বার কয়েক। কিন্তু তার রূপ ছিল সহজ, সাবলীল। কিন্তু আজকের রকম-সকম অন্যধরনের, ভাবছে ডিক। হঠাৎ থেমে গেল বাতাস, সমুদ্র থেকে ভেসে আসা গর্জন, শান্ত হয়ে গেল লেগুনের ঢেউ। অবাক হলো ডিক। কুটিরের দরজার কাছে এসে দাঁড়াল সে। আরে, আশ্চর্য! আকাশে তারা। চাঁদ ওঠেনি এখনও। হাঁটতে হাঁটতে লেগুনের কিনারে চলে এল। দেখল কি যেন খানিকক্ষণ। কুটিরের দিকে মুখ ঘুরিয়ে ইশারায় ডাকল সে এমেলিনকে। হানা ঘুমুচ্ছে। কোল থেকে নামিয়ে ভাল করে শুইয়ে দিল ওকে। বেরিয়ে এল কুটিরের বাইরে। আজকের ব্যাপারটা তাকেও অবাক করছে। হঠাৎ এসেই আবার উবে গেল কোথায় ঝড়টা!

'আমার সাথে এসো,' ফ্যাঁসফাঁসে গলায় বলল ডিক, 'একটা জিনিস দেখবে।'

আশ্চর্য হয়ে গেল এমেলিন! ডিকের সাথে হেঁটে চলে এসেছে সে জলের ধারে। নির্নিমেষ চেয়ে আছে লেগুনের দিকে। দূর থেকে লেগুনের জলকে মনে হচ্ছে যেন বিবর্ণ, ঘনীভূত একটা বিস্তীর্ণ অঞ্চল। আরও কাছে যেতে বুঝল ধোঁকা খেয়েছে সে, চোখের ভুল ওটা। লেগুন যেন আলোর মালা। আগুন ধরিয়ে দিয়েছে কে যেন। জ্বলছে লেগুনের প্রতিটি শাখা-প্রশাখা। মশালের মত। এক একটি মাছ যেন চলন্ত লণ্ঠন। জোয়ার আসছে। তারই আগাম জলে, পাথুরে মেঝের মত লেগুনের তলা জ্বলছে, নড়ছে, কাঁপছে। ছোট ছোট ঢেউগুলো পাড়ে উঠে উজ্জ্বল আলোর রেখা ফেলে রেখে ফিরে যাচ্ছে আবার। শিরশির করে একটা ঠাণ্ডা স্রোত এমেলিনের শিরদাঁড়া বেয়ে নেমে এল। কাঁপছে

সে।

'দেখো, দেখো!' কৌতূহলী ডিক পাড়ে হাঁটু মুড়ে বসে তার হাত জলের ভেতর ঢুকিয়ে দিয়েছে। চমকে ঘাড় ফিরে তাকাল এমেলিন ডিকের উত্তেজিত স্বরে। বরফের মত জমে গেল সে। নড়া-চড়া বন্ধ হয়ে গেল খানিকক্ষণের জন্য। তারপর ভাল করে চেয়ে দেখল ডিকের মুখে মিটিমিটি হাসি। দু'পা এগিয়ে গেল সে ডিকের দিকে। বসে পড়ল। চেয়ে দেখল ব্যাপারটা। বুঝল না কিছু। ডিকের ডুবে থাকা হাতের অংশটুকু জ্বলছে শিখাহীন ভাবে। বোবা দৃষ্টিতে দেখল সে ডিককে। আটাশটা দাঁত খুলে হাসছে সে। নাড়িতে টান পড়েছিল এতক্ষণ। ঢিল দিল এবার। জল থেকে ডিক তুলে নিল হাত। জ্বলন্ত দস্তানার মত দেখাচ্ছে হাতের ভিজে অংশটুকু।

লেগুনের উপরে নিচে ফসফরাসের আগুন। এই ফসফরাসের আগুন আগেও দেখেছে ওরা। আকাশে চাঁদ না থাকলে রাতে লেগুনের চলমান মাছগুলোকে দেখায় যেন রুপোর পাতের মত। কিন্তু আজকের সর্বগ্রাসী দৃশ্য আগে কখনও দেখেনি ওরা। আজকের রূপ যেন স্বপ্নের মোহ ছড়াচ্ছে।

সাহস ফিরে পেয়েছে এমেলিনও। ডিকের দেখাদেখি সে-ও পাড়ে হাঁটু ঠেকিয়ে নিজের দু'হাত জলে ডুবিয়ে হাত দুটো একজোড়া আগুনের দস্তানা বানিয়ে নিল। বিস্মিত দৃষ্টিতে হাতের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে চিৎকার করে উঠল সে খুশিতে। হাততালি দিল। হাসল। মজার খেলা পেয়েছে যেন। এ যেন আগুন নিয়ে খেলা। খেলছে ওরা দু'জন। এ আগুনে দাহ নেই। এবার ডিক আঁজলা ভরে পানি তুলে নিজের মুখে মাখতে লাগল। তার মুখ জ্বলজ্বল করছে ভৌতিক ভাবে।

মজার ভাগ হানাকে দেবার জন্য ছুটে গেল কুটিরে। নিয়ে এল ওকে। ওকে এমেলিনের কোলে দিয়ে জলে ভাসাল নৌকাটি।

দু'জনকে তুলে নৌকায় নিজে উঠল। পাড় ছেড়ে ভেসে পড়ল জলে। নৌকার বৈঠা দুটো, জলের তলার অংশটুকু রুপোর লম্বা-চওড়া খণ্ডের মত দেখাচ্ছে। নৌকোর কিনার দিয়ে মাছেরা যাচ্ছে ধূমকেতুর লেজের মত আলো ছড়াতে ছড়াতে। প্রতিটি প্রবালের টুকরো যেন এক একটি ঝাড়লণ্ঠন। জ্বলছে। সমস্ত লেগুনটাই যেন দেখাচ্ছে আলোকোজ্জ্বল নাচের আসরের মত। চিৎকার জুড়ে দিল হানা এই অস্বাভাবিক আলোর খেলা দেখে।

ডুবোপাহাড়ে নৌকো ভিড়াল ডিক। ইচ্ছেমত ঘুরে বেড়াল খানিকক্ষণ সমতল অংশটুকুতে। এখান থেকে সমুদ্রকে দেখাচ্ছে যেন শ্বেত-শুভ্র বরফের স্তূপ। ফেনাগুলো যেন আগুনের বেড়া। আগুন জ্বলছে লেগুনে।

হঠাৎ নিভে গেল বাতি। এক মুহূর্তে। হৃৎপিণ্ডের একটা স্পন্দন মিস্ করল ডিক। মুছে গেছে ফসফরাসের অনুপ্রভা। চাঁদ উঠছে। যেন পাখির ঝুঁটি, জল ছেড়ে ওঠার প্রথম দৃশ্য। দিগন্তে তাকে দেখা যাচ্ছে। এ চাঁদের রঙ লাল। ঢাকা পড়েছে যেন একটা ধোঁয়ার আবরণে। একটা হিমশীতল স্রোত শিরশির করে নেমে গেল ডিকের মেরুদণ্ড বেয়ে।

পরদিন সকাল।

ওরা ঘুম থেকে উঠল। দিনটা অন্ধকার। দিগন্ত জুড়ে স্লেট রঙের নিশ্ছিদ্র ঘন মেঘ। ধীরে ধীরে ছেয়ে গেল পুরো আকাশ। বাতাস নেই এক ফোঁটা। পাগলের মত উড়ে চলেছে পাখির ঝাঁক যেন তাড়া করেছে ওদের কোন অজানা শত্রু।

সকালের খাবার তৈরি করবে ডিক। কাঠকুটো দিয়ে আগুন জ্বালল। এমেলিন ইতস্তত পায়চারি করে বেড়াচ্ছে হানাকে বুকে জড়িয়ে। অস্থিরতায় ভুগছে সে। বেলা ওঠার সময় যেটুকু আলো ছিল—কমে গেল আরও। একটা হাওয়া উঠল। শব্দ করে উঠল

গাছের পাতাগুলো বৃষ্টির মত। ঝড় আসছে। কিন্তু ওরা যে ঝড়গুলো আজ পর্যন্ত দেখেছে–আজকের ঝড়ের আভাস যেন সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের। অচেনা।

বাতাসের গতি বাড়বার সাথে সাথে একটা শব্দ দূরের দিগন্ত থেকে ভেসে আসছে। কোলাহলের মত। যেন হাজার হাজার লোক দূরে কোথাও চিৎকার করছে। থেমে গেল শব্দটা এক সময়। শুধু বাতাস, গাছের ডালপালা আর পাতা আছড়ানোর শব্দ শোনা যাচ্ছে এখন। বাতাস বইতে শুরু করল হঠাৎ ভীষণ জোরে। লেগুনের জলে অজস্র ফেনা। ডুবোপাহাড়ের মাথায় মেঘের ভিড়। যে আকাশ এতক্ষণ সীসে বর্ণ ধারণ করে শক্ত ছাদের মত শান্ত ছিল–দ্রুত ধেয়ে গেল পুব দিকে–যেন বন্যা আসছে নদীতে। দূর থেকে এক অপার্থিব বজ্রের শব্দ ভেসে আসল ক্ষীণ ভাবে।

এমেলিন কুটিরের মেঝেতে বসে আছে। বুকে হানা। সে নির্বাক। অঘোরে ঘুমুচ্ছে হান্না। ডিক দাঁড়িয়ে দরজার কাছে। যদিও তার মনে অস্বস্তি, কিন্তু বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই।

সৌন্দর্যে ভরা দ্বীপটি ছাই রঙে ছেয়ে গেছে এখন। একটা বিষাদ ও নিদারুণ যাতনা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে যেন।

থরথর কেঁপে উঠল দ্বীপটা একটু পরেই। ঝড়ের দাপটে দুলছে কোকো-পাম গাছগুলো। বাতাসের জোর বাড়তেই মাটি ছিঁড়ে-খুঁড়ে শূন্যে উঠে পড়ল ওগুলো। তারপর আছাড় খেল মাটিতে শূন্য থেকে। কুটিরটা ঠিক লেগুনের মাঝখানে। গাছপালায় ঘেরা। তাতে ঝড়ের দাপটটা এখানে ঠিকভাবে কাজে লাগছে না। হঠাৎ আকাশ চিরে জ্বলে উঠল আলো। কান ফাটানো শব্দে পড়ল বাজ। বৃষ্টি শুরু হলো অঝোরে। ডিক সরে এল দরজা থেকে। বসে পড়ল এমেলিনের পাশে। ওকে জড়িয়ে ধরে থরথর করে কাঁপতে শুরু করল এমেলিন। অনেকক্ষণ এভাবেই বসে রইল ওরা। বৃষ্টি থেমে যাচ্ছে একবার, আবার নামছে মুষলধারে।

বাজ পড়ার শব্দ দ্বীপটাকে কাঁপিয়ে দিল। একঘেয়ে কান্নার মত চিৎকার তুলে বাতাস ছুটে চলেছে কুটিরের মাথার ওপর দিয়ে। তারপরই হঠাৎ মরে গেল বাতাস। থেমে গেল বৃষ্টি। আকাশে দেখা দিল বিবর্ণ আলো। অনেকটা ভোরের মত। ঝড় থেমেছে। ওরা নিশ্চিত হয়ে ঢুকে পড়ল কুটিরের ভেতর।

পাঁচ মিনিট পর। চারিধার সুনসান। হঠাৎ শব্দটা শুনতে পেল ওরা। গুঞ্জন করতে করতে এগিয়ে এসেছে যেন হাজার হাজার মৌমাছি। ঘূর্ণিঝড়।

ঘূর্ণিঝড় চলে ঘুরতে ঘুরতে। আঙটির আকারে। অস্বাভাবিক দ্রুত ছুটে আসে, তছনছ করে দেয় সবকিছু। কিন্তু এর কেন্দ্র বা 'চোখ' বলে যাকে–সেটা খুবই শান্ত। বাড়ছে শব্দটা। তীক্ষ্ণ, কান ফাটানো ধনুকের টংকারের মত। সাথে সাথে ভেসে আসছে গাছ ভেঙে পড়ার মড়মড় শব্দ। মগজে মুগুর পিটছে যেন ডিকের। সব অনুভূতি লোপ পেতে যাচ্ছে। কি করবে, বুদ্ধি খাটাতেও পারছে না। মাথার যন্ত্রপাতিগুলো আকেজো হয়ে গেছে যেন।

চোখের পলকে খড়কুটার মত উড়ে গেল কুটিরটা। বাতাসের গোঙানি বাড়ল আরও। ওরা তিনজন একটা গাছের গুঁড়ি আঁকড়ে ধরে পড়ে আছে। মুখে রা নেই। এমেলিন বাঁ হাতে বুকে চেপে রেখেছে হানাকে, ডান হাত খামচে ধরেছে ডিকের বাহু। চোখে আঁধার নামছে ওদের। আধমরার মত কতক্ষণ ওভাবে পড়ে ছিল জানে না। একসময় সব শান্ত হয়ে গেল। দ্বীপ ছেড়ে চলে যাচ্ছে ঘূর্ণিঝড়।

উঠে দাঁড়িয়ে এক আশ্চর্য দৃশ্য দেখল ওরা। অসংখ্য পাখি, প্রজাপতি কীট-পতঙ্গ সুসংবদ্ধভাবে বাতাসে ভাসতে ভাসতে চলেছে ঝড়ের সাথে। দ্বীপে বাতাসের গতি কম। কিন্তু পুব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ সব দিক থেকে ভেসে আসছে ঝড়ের

হুঙ্কার। প্রচণ্ড গতিতে ছুটে চলেছে কোথাও ঘূর্ণিঝড়। যে কোন ধ্বংস আনতে পারে এই বৃত্ত আকারের ঝড়। কিন্তু এর মাঝখানটায় রয়েছে প্রগাঢ় শান্তি। কেন্দ্রের বাইরের বাতাসই ক্ষতি করে ভীষণ ভাবে।

ঘূর্ণিঝড় যখন পাখি, সী-গাল, প্রজাপতি, কীট-পতঙ্গকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, প্রচণ্ড গর্জন করে দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ থেকে শেষ ঝড় ঝাঁপিয়ে পড়ল দ্বীপের ওপর। শুরু হলো তাণ্ডব।

মাঝরাতে পড়ে গেল বাতাস। সকালে দেখা দিল সূয্যিমামা। কোন দুঃখ নেই তার। ঝলমল করে উঠল দ্বীপ। দিনের আলোয় ধ্বংসের রূপ দেখতে পাচ্ছে পরিষ্কার ভাবে। অসংখ্য গাছ পড়ে আছে চিৎপাত হয়ে। অজস্র পাখির মৃতদেহ ছড়িয়ে আছে ইতস্তত। কয়েকটা বেতের অংশ ছাড়া কুটিরটা যে কোনদিন ওখানে ছিল বোঝাই যায় না। লেগুনের জল বিবর্ণ। ধূসর কাঁচের মত ফেনা মাথায় করে সমুদ্র আছড়ে পড়ছে ডুবোপাহাড়ের চুড়োয়।

সর্বস্বান্ত হয়ে গেছে ওরা।

কিন্তু ডিক বসে নেই। সংসারের টুকিটাকি জিনিসগুলো খুঁজতে শুরু করেছে সে। সভ্য সমাজে এগুলোর হয়তো কোন মূল্য নেই। কিন্তু এখানে, এই সভ্যতার সংস্পর্শ ছাড়া একটা জনহীন দ্বীপে, অতি সামান্য জিনিসও ওদের কাছে অনেক মূল্যবান।

করাতটা নজরে পড়ল ওর প্রথমেই। একটা গাছের নিচে চাপা পড়ে আছে। এরপর পাওয়া গেল ছুরিটা। অবস্থান দেখে আন্দাজ করল ডিক—ঝড় নিয়ে যেতে চেয়েছিল এগুলোকে। কিন্তু পারেনি। কড়া নজর ডিকের। কুটিরের আশপাশের প্রতিটি ইঞ্চি সে তল্লাশী চালাচ্ছে। যে কয়েক টুকরো কাপড় ছিল ওদের তার সবটুকুই

উড়ে গেছে সাইক্লোনে। খুঁজতে খুঁজতে একটা কৃশ নারকেল গাছের মাথায় নজর পড়তেই হেসে ফেলল সে। যেন ব্যান্ডেজ বাঁধা পা একটা, এমন ভাবে পেঁচিয়ে আছে গাছের সাথে ওদের কাপড়গুলো। একটা নারকেল গাছের শরীরে বিদ্ধ হয়ে আছে মাছ ধরার বড়শিগুলো। 'কোনান ডোয়া' জাহাজ থেকে যে পাল জোগাড় করে আনা হয়েছিল একদিন, সেটা উড়ে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে ডুবোপাহাড়ের মাথায়। এ পালটাকে আরও দূরে উড়ে যাবার পথ রুদ্ধ করেছে একটা বড় প্রবালের টুকরো। নৌকোর চৌকো পালটিকে আর শেষ পর্যন্ত খুঁজেই পাওয়া গেল না।

গত রাতে ঝড়ের সময়, এমেলিন অন্তত তিনবার অনুভব করেছে প্রচণ্ড বাতাস তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে চেয়েছিল হানাকে। ওগুলো শিশু ঝড়। আসল ঝড়টার পাশাপাশি আরও ছোটখাট ঘূর্ণি ওঠে, এরা হলো দুষ্টু বাচ্চা ঘূর্ণি। হানাকে বড্ড হিংসে ওদের তাই ছিনিয়ে নিতে এসেছিল। এমেলিন এ ব্যাপারে নিশ্চিত, ওদের মতলব ছিল তার শিশুকে বুক থেকে টেনে নিয়ে সাগরে ফেলে দেওয়া।

ঘুরে ফিরে ডিক একটা ব্যাপারে সন্তুষ্ট হলো যে, ডিঙি ডুবে গেছে জলে। ফলে ঝড়ের তাণ্ডব কোন ক্ষতি করতে পারেনি ওটার। কোন আঁচড় পর্যন্ত পড়েনি নৌকোটাতে। পরবর্তী ভাটার সময় ডিঙিটা জল থেকে তুলে নিতে কোন কষ্টই হলো না ওর। আগের মতই ভাসছে ওটা এখন।

কিন্তু বনের গাছগাছালির ক্ষতি হয়েছে ভয়ঙ্কর। কোথাও তালগোল পাকিয়ে আছে গাছগুলো, কোথাও এমন ভাবে উড়ে গেছে যে ফাঁকা হয়ে গেছে জায়গায় জায়গায়। মুমূর্ষের মত ধুঁকছে বড় বড় নারকেল গাছগুলো। কোমর ভেঙে পড়ে আছে নুয়ে। যেন লাথি মেরেছে কেউ সজোরে। দলে-মুচড়ে মোটা তারের আকার নিয়েছে অসংখ্য লায়না লতা। তাল গাছের এলাকাটায় তো হাঁটাই

যায় না। লাথি মেরে ফল সরিয়ে পথ করে নিতে হচ্ছে ডিককে। একটা গাছও সোজা নেই। ঝুঁকে পড়েছে। কাঁঠাল গাছগুলো নষ্ট হয়ে গেছে ভেঙে।

আশ্চর্যজনক ভাবে একটা পথ হয়ে রয়েছে এই ধ্বংসস্তূপের মাঝখানে। যেন বিরাট এক সেনাবাহিনী, তাদের কামান, অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঘোড়ায় চেপে অথবা মার্চ করে লেগুনের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত সমস্ত কিছু দলিত মথিত করে সাফ একটা রাস্তা বানিয়ে নিয়েছে। এই রাস্তাটা অবশ্য ঝড়ের পয়লা পদক্ষেপ। শুধু এই বনেই নয়, খোঁজ করলে দেখা যাবে অন্য বন-জঙ্গলেও এভাবে পথ করে এগিয়ে গেছে ঝড়ের সৈন্যরা। এমন কি ঝড়ের দুষ্টু ছেলেরা যে পথে গেছে সেখানেও এ ব্যাপারে ক্ষমতা দেখাতে কমতি করেনি।

এই হাড়-পাঁজর বের করা বন থেকে আশ্চর্য সুগন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। এ যেন স্বর্গের সুবাস। অসংখ্য নষ্ট ফুল, লায়না, ভাঙা গাছের গুঁড়ি, বট গাছের ডাল, কাঁঠাল গাছের মটকানো অংশ থেকে ছড়িয়ে পড়ছে এক অদ্ভুত মিলিত সুগন্ধ।

অসংখ্য মৃত প্রজাপতি ও পাখি পড়ে আছে এখানে-সেখানে। ঝড়ের পথে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে প্রজাপতির পাখনা, পাখির লেজ, কলমি লতার ছেঁড়া কুটি কুটি অংশ। মনে হচ্ছে যেন কেউ মজা করার জন্য আঙুল দিয়ে ওগুলো টুকরো টুকরো করেছে।

সাইক্লোন হলো সেই শক্তিমান হাওয়া যা একটা জাহাজ ডুবিয়ে দিতে পারে, গুঁড়িসুদ্ধ গাছ ফেলতে পারে উপড়ে, ধ্বংস করে দিতে পারে একটি সাজানো শহরকে এবং বনের প্রজাপতির পাখনাও ছিঁড়তে পারে। বনের ভেতর ধ্বংসলীলার রূপ দেখতে দেখতে হানাকে কোলে নিয়ে এমেলিন ঘুরে বেড়াচ্ছিল ডিকের সাথে। গতকালের সেই ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি, কীট পতঙ্গের একসাথে সাইক্লোনের টানে উড়ে যাবার দৃশ্য ভেসে উঠল তার

চোখের সামনে। কিন্তু তাদের ও হানাকে দয়া করেছে ঝড়। নইলে সমুদ্রের নীল জলে উড়িয়ে ফেলতে ঝড়ের কতটুকু কষ্টই বা হত! সভ্য দেশে যাকে বলা হয় 'ভাগ্য'—ঝড়ের অবিরাম ভয়ঙ্কর ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে এমেলিনও এ কথা মেনে নেওয়া ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারে না। ঘূর্ণিঝড় তাদের সাথে ভদ্র ব্যবহারই করেছে বলতে হবে। কুটিরটা উড়ে গেছে তাদের। যাক। ওটা তেমন বড় ব্যাপার নয়। গড়া যাবে আবার। তাদের অতি প্রয়োজনীয় ও মহামূল্যবান জিনিসগুলো রয়ে গেছে। চকমকি পাথর, করাত, ছুরি চলে গেলে দশটা কুটির থাকলেও কোন লাভ হত না তাদের। বিশেষ করে চকমকি পাথর, ওটা না হলে আগুনই জ্বালা যেত না।

ঈশ্বরের কাছেই ঋণী রইল ওরা ঘূর্ণিঘড়ের এই রহস্যময় উদারতার জন্য।

পরদিন।

ঘর বানানোর কাজে লেগে গেছে ডিক। ডুবোপাহাড়ের মাথা থেকে পালটা তুলে এনেছিল সে। ওটা দিয়ে একটা তাঁবু করে আপাতত বাস করছে ওরা।

বন থেকে বেত আনা এক কঠিন কাজ। এমেলিন সাহায্য করল তাকে এই কাজে। ওরা দু'জন যখন ব্যস্ত, হানা তখন খেলছে কোকোর সাথে। কোকো কোথাও চলে গিয়েছিল ঝড়ের সময়। গত সন্ধ্যায় ফিরে এসেছে সে তার অজানা বাসস্থান থেকে। পয়লা থেকে কোকো হানার বন্ধু। এখন সেটা হয়েছে আরও গাঢ়। হানা তার ছোট দুটো হাতে জড়িয়ে ধরে পাখিটাকে।

একটা পাখিকে জড়িয়ে ধরা মানুষের পক্ষে এক দুর্লভ অভিজ্ঞতা। পোষমানা পাখি, যে ভীত নয়, ছটফট করে না ধরলে,

AMARBOI.COM

এমন পাখিকে বুকে জড়িয়ে ধরলে রমণীয় নরম দেহের সুখ পাওয়া যায়।

হানা বুদ্ধিমান উজ্জ্বল শিশু। কিন্তু সে-ই যে একবার 'ডিক' বলে ডাক দিয়েছিল, তারপর জিভের জড়তা কাটতে সময় নিয়েছে অনেক। যদিও জিহ্বাকে সে খাটায় না কথা বলার জন্য, কিন্তু তার মনের কথা প্রকাশ করার আলাদা ভঙ্গি আছে। হাত-পা, শরীরের নানারকম অঙ্গভঙ্গি দিয়েই সে তার মনের ভাব প্রকাশে পটু হয়ে উঠেছে। খুব ফুর্তি এলে সে হাত দুটো ঝাঁকাতে থাকে প্রবলভাবে। যদিও তার রাগের বালাই নেই কিন্তু রাগলে ভীষণ লাল হয়ে ওঠে তার চেহারা।

এখন হানার যা বয়স, তাতে তার খেলনা নিয়ে ব্যস্ত থাকার কথা। সভ্য জগতে তার জন্ম হলে এতদিনে সে নিশ্চয় একটা রবারের কুকুর অথবা উলের তৈরি ভেড়ার মালিক হত কিন্তু এখানে খেলনার, অন্তত সভ্য জগতের খেলনার অস্তিত্বই নেই। ওরা যখন দ্বীপের এই অঞ্চলে চলে আসে; এমেলিনের সেই অদ্ভুত ন্যাকড়ার পুতুলটা ফেলে এসেছিল। বছরখানেক আগে, একবার তার অভিযানের সময় পুরানো জায়গায় বালুর মধ্যে আধখানা পোঁতা অবস্থায় পুতুলটা পায়। কৌতূহল বশেই ডিক ওটা এই কুটিরে নিয়ে আসে। একটা তাকের ওপর রেখে দিয়েছিল সেটা। ঝড়ে উড়ে গিয়ে একটা গাছের ডালে আটকে গেছে পুতুলটা। ঝড় বুঝি রসিকতা করেই এ কাজ করেছিল। নামিয়ে এনে ডিক হানাকে উপহার দিল ওটা। ভীষণ বিরক্তিতে চোখ-মুখ কুঁচকে গেল শিশুর। লাল হয়ে উঠল মুখ। রেগেছে সে। খানিকক্ষণ তীব্র দৃষ্টিতে ওটাকে দেখে ছুঁড়ে ফেলে দিল দূরে।

হানার খেলনাগুলো বিচিত্র ধরনের। ফুল, নানা রঙের শঙ্খ, ঝিনুক, প্রবালের টুকরো। ওগুলো ঘাসের ওপর সাজিয়ে সাজিয়ে কল্পনার ভিত্তিতে বিভিন্ন জিনিস তৈরি করে সে। গুহাবাসী প্রস্তর

যুগের শিশুদেরও হয়তো এই সব খেলনাই আনন্দ দিত। একটা ঝিনুকের দুটো শক্ত খোলা দিয়ে বাজনা বাজালে যে খটাখট শব্দ হয়, সেই শব্দের চেয়ে হানার কাছে আনন্দদায়ক আর কি হতে পারে?

বিকেল হয়ে গেল নতুন বাড়িটা তৈরি করা শেষ করতে। পুরো হলো না অবশ্য, মোটামুটি একটা আকৃতি নিতেই মনোযোগ হারাল ডিক। এখন একটু বিশ্রাম দিতে চায় সে নিজেকে। কাজ শেষ করে ঢুকে গেল বনের ভেতর। সাথে এমেলিন। তার কোলে হানা। মাঝে-সাঝে ডিকও কোলে নিচ্ছে তাকে। ওরা চলেছে 'শিলা-মানব' উপত্যকার দিকে।

ওদের ছোট্ট সংসারে হানার আগমন পর্যন্ত রহস্যময় এই মূর্তিগুলোকে ভয়-মেশানো শ্রদ্ধা করত এমেলিন। এখন এই মূর্তি তার কাছে আশীর্বাদস্বরূপ। এরই ছত্রছায়ায় তাদের জীবনে এসেছিল প্রেম। একটি শিশুর আত্মা তার শরীরে করেছিল প্রবেশ। একদা যে মূর্তিটা অজানা আদিবাসীদের দেবতা ছিল, সেই দেবতা এখন ধর্মের চেতনা এনেছে এমেলিনের মনে। এমেলিনই হয়তো এই পাথরের দেবতার শেষ পূজারিণী।

ডিক আর এমেলিন, হানাকে নিয়ে যখন এই উপত্যকায় পৌঁছুল তখন সূর্য যায় যায়। কমলা আলোয় দ্বীপ রঙিন হয়ে উঠেছে। মূর্তিটার দিকে দৃষ্টি পড়তেই নাড়িতে টান পড়ল এমেলিনের। কলজেটা মোচড় দিয়ে উঠল। টন টন করছে বুকটা। চোখ জ্বালা করে উঠল। কান্না লুকোতে পারল না সে।

মুখ থুবড়ে পড়ে আছে সেই অলৌকিক দেবতা। বিশাল পাথরের মূর্তিটা টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে আছে চারদিকে।

আত্মনিবেদনের শেষ অবলম্বনটুকু হারিয়েছে আজ এমেলিন।

নিশ্চয় একটা ধস নেমেছিল এখানে, ধারণা করল এমেলিন। বহুদিন ধরেই এই ধ্বংসের বীজ সুপ্ত ছিল হয়তো। ঘূর্ণিঝড়ের

সাথে প্রবল বৃষ্টিপাত শেষ করেছে বাকি কাজটুকু। প্রশান্ত মহাসাগরের পোনাপে, হুয়াহাইন, ইস্টার আয়ল্যান্ড দ্বীপগুলোতেও একই দৃশ্য দেখা যায়। বিরাট বিরাট পাথরের দেবতারা চুর চুর হয়ে পড়ে আছে ভেঙে। এক একটা চত্বর, পাহাড়ের মতই যা কঠিন ছিল, কালের কবলে পড়ে তাতে স্তূপের মত হয়ে আছে বিকৃত পাথর।

পরদিন সকাল।

তাঁবুর ভেতর উঁকি দিল সূর্যের আলো। ঘুম ভেঙে গেল এমেলিনের। নতুন কুটিরটা তৈরি হয়নি এখনও পুরোপুরি। পালের উদ্ধার করা অংশগুলো দিয়ে তৈরি হয়েছে তাঁবুটা।

এ অঞ্চলে সকাল হয় একটু দেরিতে। সমুদ্রের কাছটা অবশ্য সূর্যের প্রথম আলোর দেখা পায়। কিন্তু এখানে গাছগাছালির উচ্চতা ও ঘনত্বের জন্য আলো ফোটে দেরিতে। সমুদ্রতীর থেকে খানিকটা দূরে ডুবোপাহাড়। পাহাড়ের ফাঁকে, পুব দিগন্তে, সমুদ্রের একেবারে সীমা রেখায় গাঢ় নীল আকাশে প্রথম দেখা দেয় লালচে আভা। তারপর সূর্যের চোখ ঝলসানো আলো ধীরে ধীরে প্লাবিত করে দেয় লেগুনকে। যেন লেগুনের ছোট ছোট ঢেউগুলোকে ধরার জন্য হাত বাড়ায় সূর্য।

কিন্তু দ্বীপের অপর দিকের দৃশ্য তখন ভিন্নরকম। তখনও হয়তো ভোরের আলো ফোটেনি। আকাশে তারা। গাছগাছালিগুলো দাঁড়িয়ে আছে মখমলের ছায়া ফেলে। ধীরে ধীরে আড়মোড়া ভেঙে ঘুম থেকে জাগে গাছেরা। পাতাদের নড়াচড়ার খসখস শব্দ। ডুবোপাহাড়ে সমুদ্রের ঢেউ আছড়ে পড়ার দূরাগত ধ্বনিও ক্ষীণ হয়ে আসে। ভোরের বাতাস বইতে থাকে দ্বীপের ওপর। নক্ষত্রেরা উধাও হয় আস্তে আস্তে। আকাশের রঙ তখন বিবর্ণ নীল। ওখানে সকাল যেন এক অনির্বচনীয় রহস্যে মোড়া।

এমেলিনের ঘুম থেকে ওঠার পরই অবশ্য ডিকের ওঠার অভ্যেস। ডিকের ঘুম ভাঙলে হানা এবং ওরা দুজন তৃণভূমি পেরিয়ে জলের ধারে চলে আসে। ঝাঁপিয়ে পড়ে ডিক জলে। হানাকে কোলে নিয়ে এমেলিন ওর স্নান করা দেখে পাড়ে দাঁড়িয়ে। এক একটা বড় ঝড়ের পর আবহাওয়া পাল্টে যায় দ্বীপের। প্রকৃতি যেন উল্লাসে মেতে ওঠে। আজকের সকালে যেন বসন্তের ডাক। এমেলিন প্রকৃতির এই স্পর্শ অনুভব করছে যেন। সাঁতার কাটতে থাকা ডিককে দেখে সে উজ্জ্বলভাবে হাসছে। হানাকে উঁচু করে তুলে ধরে ডিকের কসরত দেখাচ্ছে। বাতাসে ভেসে আসছে বনের সুগন্ধ। এমেলিনের কালো চুল উড়ছে। তালগাছের ফাঁকে ফাঁকে সূর্যের আলো। হানা আর এমেলিনের ওপর এসে পড়েছে সে আলো। প্রকৃতি যেন সোহাগে ভরিয়ে দিচ্ছে ওদের।

স্নান শেষ করে পাড়ে এসে উঠল ডিক। পানি শুকোবার জন্য কিছুক্ষণ ছুটোছুটি করল হাওয়ায়। তারপর ছুটল ডিঙির দিকে। ভালভাবে পরীক্ষা করে নিল ঠিক-ঠাক আছে কিনা। আজ তার ইচ্ছে, আধবেলা ঘর বানানোর কাজে কামাই দিয়ে পুরানো জায়গাগুলো দেখতে যাবে। ঝড়ের পরে কলাগাছগুলোর কি অবস্থা–দেখাটা খুবই দরকার। কলার প্রতি ওর অদ্ভুত এক দুর্বলতা আছে। এই দ্বীপটা তো এমনিতেই খাদ্যের ভাণ্ডার। আর কলা ডিকের সবচেয়ে প্রিয় বার। বনের গাছগুলোর প্রতি তার একটা গৃহিণীসুলভ মনোভাব। কলাগাছগুলোর কি অবস্থা হয়েছে–না দেখলে সে শান্তি পাচ্ছিল না।

লেগুনের তীর থেকে ফিরে এল ওরা কুটিরে। খাবার তৈরি করতে লেগে গেল। ভিজে কাঠকুটো রোদ্দুরে শুকিয়ে নিয়েছিল ডিক। তাছাড়া নারকেলের ছোবড়া আগুন জ্বালবার পক্ষে অপূর্ব। এটা আবিষ্কার করেছিল ও আগেই।

খাবার তৈরি হলো। একসাথে খেল তিনজন। উঠে দাঁড়াল ডিক। ছুরি ও বল্লম সাথে নিয়ে ছুটল নৌকোর দিকে। এমেলিন হানাকে নিয়ে ছুটল পেছনে। নৌকো জলে ভাসিয়ে তাতে চড়ে বসতেই এমেলিন ডাকে, 'ডিক!'

'বলো।'

'আমি যাব।'

'তুমি!' ডিক অবাক।

'হ্যাঁ।'

'ভয় পাবে না?'

'এখন–এখন আর ভয় পাই না আমি।'

সত্যি সত্যিই হানার জন্মের পর দ্বীপের অন্য অংশটার সেই ভয়াল স্মৃতি মন থেকে মুছে ফেলেছে এমেলিন। মৃত্যু অন্ধকারে ভরা। কিন্তু জন্ম–আলোয় ঝলমল। হানার জন্মের আনন্দ বাটনের মৃত্যুর বুক কাঁপানো স্মৃতিকে মুছে দিয়েছে তার ভেতর থেকে।

কত বছর আগে পৃথিবী থেকে মুছে গেছে একটি জীবন। তার মনের দুয়ারে হঠাৎ খিল পড়ে গিয়েছিল সেদিন। সেই বুড়ো, প্রিয় বন্ধু বাটন। চিৎ হয়ে পড়ে আছে। মুখ থেকে বেরিয়ে আসছে জীবন্ত কাঁকড়া। অকল্পনীয় ভয়ে শিউরে উঠেছিল এমেলিন। স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল বুকের ভেতরটা। সেই ভয় প্রকাশের কোন ভাষা সে খুঁজে পায়নি। কোন ধর্ম বা দর্শনের ব্যাখ্যা সে জানে না। কাজেই ওই ভয় দূর হবার কথাও নয়। কিন্তু রহস্যময় আগন্তুক হানার আগমনে খুলে গেছে মনের বন্ধ দুয়ার। মনের গভীর তলে একটা ব্যাখ্যা খুঁজে পেয়েছে সে। বুড়ো চাচা বাটনই হানা হয়ে ফিরে এসেছে।

হানাকে নিয়ে নৌকোয় উঠে পড়ল এমেলিন। বসল গলুইয়ে। নৌকো ভাসাল ডিক। বৈঠা হাতে নিয়ে বাইতে যাবে, এমন সময় ছুটল আরেকজন যাত্রী। কোকো। ডিকের সাথে বার কয়েক ওই

অঞ্চলে গেছে কোকো। কিন্তু একা সে কখনও ওদিকে উড়াল দেয় না। কয়েকবার চক্কর কেটে নৌকোর বৈঠায় বসে পড়ল সে। তার লম্বা রঙিন লেজ ঝুলে রইল জলের দিকে।

পাড় ঘেঁষে নৌকো বাইছে ডিক। ছোট্ট অন্তরীপটা ঘুরে যেতেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে দ্বীপের রঙিন দৃশ্য। তীরের কাছ ঘেঁষা নারকেল গাছ আর ঝোপগুলোতে ধাক্কা খেতে খেতে এগিয়ে চলেছে নৌকো। বার বার হাত বাড়িয়ে গাছগুলো ধরবার চেষ্টা করছে খুশিতে উজ্জ্বল শিশু হানা। এমেলিন হাত বাড়িয়ে একটা ডাল ভেঙে নিল ডিকের অলক্ষ্যে। খেলতে শুরু করল ওটা নিয়ে হানার সাথে।

'এক্ষুণি ফেলে দাও।' হঠাৎ চিৎকার করে উঠল ডিক। 'ওটা কুঁচ ফল! ভুল করে হানা খেয়ে ফেললে ঘুম আসবে, ভাঙবে না আর কোনদিন।'

ডালটাকে ধরবার জন্য হানা লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছিল। ধরতে গেলেই এমেলিন তুলে নেয় ওটা নাগালের বাইরে। খিলখিল করে হাসছিল হানা। ডিকের চিৎকারে ভয় পেয়ে বসে পড়ল। এমেলিন তাড়াতাড়ি ওগুলো ফেলতে গেল। কিন্তু ছিটকে নৌকোর মাঝখানে চলে এল সে। আরেকটু হলেই পানিতে পড়ে যেত। নৌকোর তলায় কিসের যেন আঘাত লাগল। উন্মত্ত হয়ে উঠেছে নৌকোর চারপাশের জল। এমেলিনের হাত থেকে ফলসুদ্ধ ডালটা পড়ে গেল খোলের মধ্যে।

জলের নিচে লড়াই চলেছে। সঙ্গম ঋতুর সময় লেগুনের জলে এমনি যুদ্ধ চলে। প্রচণ্ড এবং ভয়ঙ্কর। মানুষের মত মাছেদেরও আছে প্রেম, ভালবাসা আর ঈর্ষা। এমনি এক লড়াইয়ের সময় নৌকোর তলায় লেগেছে আঘাত। ভয় পেয়ে এমেলিন আরও জোরে নৌকো বাইতে বলল ডিককে।

AMARBOI.COM

ডিক এমন এক জায়গায় নৌকো নিয়ে এল, এমেলিন যা দেখেনি এর আগে। আসলে মনে নেই ওর ছেলেবেলার স্মৃতি। বাটন যখন নৌকো ভিড়িয়েছিল এখানে, তখন এমেলিন ছিল গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন।

কাঁঠাল গাছের নিচে ভাঙা সেই পুরানো কুটিরটা দেখতে পেল এমেলিন নৌকো থেকে। বন আর বনের মাঝখানটা ফাঁকা। খুব অস্পষ্টভাবে হলেও এমেলিনের স্মৃতিতে জেগে ওঠে ফেলে আসা দিনগুলোর কথা। কুটিরটা ছোট্ট, তবু সুন্দর। এমেলিনের মন কেমন যেন করে উঠল ভাঙা ঘরটার জন্য। নৌকোর গতির জন্য কুটিরের দৃশ্যটা দ্রুত সরে গেল। মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখছে হানা চারদিকের দৃশ্য। একটু আগে ভয় পেয়েছিল সে নৌকো দুলে উঠতে। কেটে গেছে সেটা। আঙুল তুলে এমেলিন দৃশ্যগুলো বোঝাতে লাগল হানাকে।

যেখানে একদিন একটা অ্যালবিকোর বড়শি দিয়ে গাঁথতে চেষ্টা করেছিল, সেখানে এসে দাঁড় টানা বন্ধ করল ডিক। ঘটনাটা বলল সে এমেলিনকে। ডিকের মনটা তাজা হয়ে আছে। হাঙরের গল্পটা হাসতে হাসতে শেষ করতে গিয়ে অবাক হলো সে এমেলিনের দিকে চেয়ে। তার মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। বল্লমটা পাবার পর আদিবাসী আর ক্যানো নৌকোগুলোর কথা শুনে ভয় পেয়েছিল সে ভীষণ। আজ হাঙরের কথা শুনে ভেতরটা কেঁপে গেছে এমেলিনের।

'সে সময় একটা বড় বড়শি থাকলে গেঁথে ফেলতাম ব্যাটাকে,' পানির দিকে চেয়ে কথাটা বলল ডিক। মনে হয় এখনও সে তার শত্রুকে খুঁজছে।

হানাকে বুকের ভেতর আরও আঁকড়ে ধরে এমেলিন বলল, 'ও সব ভুলে যাও।'

ডিক আবার দাঁড় তুলে নিল হাতে। ওর মুখে অস্থিরতার

চিহ্ন। এমেলিন একগুঁয়ে ডিককে চেনে। জানে, প্রতিশোধ নেবার কথা এখনও ভাবছে ডিক। শেষ শৈলান্তরীপ, সৈকতের উঁচু পাড় পার হয়ে গেল ডিক। আর তারপরই ডুবোপাহাড়ের খাঁড়ির অংশ ভেসে এল চোখের সামনে। এমেলিন স্তব্ধ হয়ে দেখছে। তার নিঃশ্বাস বন্ধ। জায়গাটার সব কিছুই ঠিক আছে, তবু যেন কোন এক দুর্বোধ্য পরিবর্তন হয়েছে। এখান থেকে বেশ সংকীর্ণ দেখাচ্ছে লেগুনকে। খাঁড়ি অনেক কাছে। বাল্যের স্মৃতির সাথে মিলিয়ে নিচ্ছিল এমেলিন। ডুবোপাহাড়ের উপর কালো দাগ অদৃশ্য হয়ে গেছে। কোকো-পাম গাছগুলো আগের চেয়ে বেঁটে দেখাচ্ছে। জায়গাটাকে যেন ধুয়ে-মুছে সাফ করে দিয়ে গেছে ঝড়।

বালুর একটা ঢালু অংশে নৌকো তুলে রাখল ডিক। এমেলিন ও হানাকে নৌকোতেই বসে থাকতে বলে কলাগাছের সন্ধানে গেল সে। এমেলিনের ইচ্ছে ছিল ডিকের সাথে যাবার। কিন্তু হানা ঘুমিয়ে পড়াতে তা আর হলো না। ইতোমধ্যে আরেকবার এসে ডিক বড় একটা কলাপাতা দিয়ে গেল যাতে রোদ্দুরের হাত থেকে রেহাই পায়। পাতাটা হাতে ধরে ডুবোপাহাড়ের সাদা বালুর দিকে চেয়ে রইল এমেলিন।

তাকিয়ে থাকতে থাকতে ওর মন উধাও হয়ে গেল অতীতে। কত রঙিন ছবি ভেসে উঠছে তার চোখের সামনে। সবুজ পানি, জাহাজের কিছুটা অংশ...অস্পষ্ট অক্ষরে 'কোনান ডোয়া' লেখা একটা শব্দ...ওদের এই দ্বীপে নামা...বালুকাবেলা...ছোট্ট এক সেট চায়ের কাপ, প্লেটগুলো বিছানো...কাপ-প্লেটের গায়ে নীল ফুল আঁকা...সীসের চামচ...খাঁড়ির আকাশে ঝুলে থাকা রাতের তারা...ক্লারিকুন আর পরী...ঝর্নার পাশের সেই পিপে...কলমি ফুল ফুটে রয়েছে...পাহাড়ের উপর থেকে দেখা গাছগুলোর ডালপালার আন্দোলন...বাটন...তার চিৎ হয়ে শুয়ে থাকা...মুখ হাঁ হয়ে আছে...একটা জ্যান্ত কাঁকড়া বেরিয়ে আসছে...ভয়ে কাঁটা

দিয়ে উঠল এমেলিনের সর্বশরীর। তারপর ডিকের উদ্দেশে আকুলভাবে তাকাল পাড়ের দিকে। ওর শূন্য দৃষ্টি ফিরে এল। পাড়ের দিকে দৃষ্টি গেল তার। 'একি!' অস্ফুট একটা শব্দ ছিটকে বেরিয়ে এল ওর মুখ দিয়ে। এইমাত্র নৌকোটা পাড়ের বালিতে ছিল–অথচ এখন! বিস্মিত আর আতঙ্কিত দৃষ্টিতে চেয়ে দেখল সে–নৌকো আর পাড়ের মাঝে নীল জল! নৌকো জলে ভাসছে! ভয়ের হিমশীতল একটা স্রোত শিরশির করে নেমে এল তার মেরুদণ্ড বেয়ে।

ঘুরছে ডিক মনের আনন্দে।

বনের এই অংশে ঝড়ের তাণ্ডব অত না হলেও ক্ষতি কিন্তু কম হয়নি। যেখানে ডিক যেতে চেয়েছিল, সেখানে যাবার পথে বিস্তর বাধা। ভূপাতিত গাছ আর জটপাকানো লতাগুল্ম টপকে টপকে পেরুতে হচ্ছে তাকে।

ঈশ্বরের খেলা! কলাগাছগুলোর তেমন ক্ষতি হয়নি। কাঁদিগুলো অক্ষত অবস্থায় ঝুলছে গাছে। দুটো কাঁদি কেটে নিল সে। একটা কাঁদি কাঁধে নিয়ে পড়ে থাকা গাছগুলো ছোট ছোট লাফে পেরিয়ে নৌকোর দিকে এগুতে লাগল। মাথা ঝুঁকে পড়েছে তার একটা কাঁদির ভারেই।

অর্ধেক পথ এগিয়েছে, দূর থেকে ভয়ার্ত একটা চিৎকার ভেসে এল তার কানে। মাথা তুলে দেখল নৌকোটা লেগুনের মাঝে ভাসছে আর এমেলিন প্রবলভাবে হাত নেড়ে ডাকছে তাকে। দুটো বৈঠার মধ্যে একটা ডাঙ্গা আর নৌকোর মাঝখানের জলে ভাসছে। নিশ্চয় এমেলিন দাঁড় টেনে ফিরে আসবার চেষ্টা করেছিল। অভ্যেস নেই। পড়ে গেছে জলে। হঠাৎ বিজলী চমকের মত কথাটা মনে পড়ল ডিকের। ঘাড়ের চুল দাঁড়িয়ে পড়ল সড়সড় করে। এখন জোয়ারের সময়। জল ফিরে যাচ্ছে সাগরে।

কলার কাঁদি ফেলে দিল ডিক কাঁধ থেকে পলকে। জ্যামুক্ত তীরের মত ছুটল সে সৈকতের দিকে। এমেলিন নৌকোর উপর দাঁড়িয়ে। অপলকে চেয়ে আছে সে ডিকের দিকে।

নৌকোটা জলের মাঝে দেখতে পেয়ে দাঁড় বেয়ে ডাঙ্গায় ফিরবার চেষ্টা করেছিল এমেলিন। ভয়, আতঙ্কে হাত কাঁপছিল তার। দাঁড় পড়ে গেল জলে। একটা দাঁড় নিয়ে সে অসহায় হয়ে পড়ল। তা ছাড়া গলুইতে বসে একটা দাঁড় দিয়ে নৌকো চালানোর কায়দাও সে জানে না। ভয় কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করল পয়লা। ভাবল, ডিক এসে পড়বে। ডাঙ্গা আর নৌকোর দূরত্ব বাড়ছেই। ডিকের পাত্তা নেই। ওর শরীর ভয়ে বরফ হয়ে গেল। খাঁড়ির ভয়ঙ্কর দৃশ্য ক্রমেই কাছিয়ে আসছে। বড় হয়ে আসছে উন্মুক্ত মুখের হাঁ। খাঁড়ির ফাঁকে নৌকোটাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে সমুদ্র। তখনি দেখতে পেল সে ডিককে।

ঝাঁপিয়ে পড়ল ডিক জলে। হাত-পাগুলো প্রপেলারের মত দ্রুত পানি কাটছে। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আছে এমেলিনের। দাঁড়টা ধরে ফেলল ডিক। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল এমেলিন। আর অল্প খানিকটা পথ। দ্রুত এগিয়ে আসছে ডিক। ধরে ফেলবে নৌকাটাকে। গভীর আগ্রহ নিয়ে দেখছে এমেলিন। চোখে পলক নেই। মাত্র ফুট দশেক দূরে এখন ডিক নৌকো থেকে। হঠাৎ পাথর হয়ে গেল এমেলিন। ডিকের পেছনে চলে গেছে তার দৃষ্টি। বরফের মত জমে গেছে সে। জলকে দু'টুকরো করে কেটে আসছে একটা ত্রিকোণ কালো ছায়া। ভেসে উঠল জলের ওপর। তীক্ষ্ণ তলোয়ারের মত ছায়াটা ঢেউ তুলছে পানিতে। এগিয়ে আসছে তীব্র গতিতে। ডিকের দিকে।

ছায়াটা হলো লেগুনের রাজা। চল্লিশ বছর আগে সমুদ্রের ঢেউয়ে ভাসতে ভাসতে এই শিশু ত্রিকোণ জীবটি যখন এখানে আসে, তখন অনেক শত্রু তার। ডগ ফিশদের তীক্ষ্ণ ধারাল

চোয়াল থেকে আত্মরক্ষা করেছে সে। অ্যালবিকোর আর স্কুইডদের আক্রমণ থেকেও বাঁচাতে পেরেছে নিজেকে। মৃত্যু হামলা করেছে বারবার। কিন্তু প্রতিবারই রক্ষা পেয়েছে অলৌকিক উপায়ে। এদের মত প্রাণী সমুদ্রে জন্মগ্রহণ করে অনেক, কিন্তু বাঁচে কম। সে বেঁচে আছে।

পরবর্তী তিরিশ বছর ধরে সে লেগুনের ভয়ঙ্কর হিংস্র বাদশা। লেগুনের অনেক উত্থান, অনেক পতন, অনেক পরিবর্তন তার চোখের সামনেই হয়েছে। আজ পর্যন্ত এই প্রাণীটির পেটে যা গেছে, পরপর সাজিয়ে দিলে মোটামুটি একটা পাহাড়ের আকার ধারণ করবে ওগুলো। ভীষণ নিষ্ঠুর। হৃদয়হীন। তার শত্রুতা তলোয়ারের খোঁচার মত তীক্ষ্ণ। লেগুনের আত্মা সে।

চিৎকার করে উঠল এমেলিন আতঙ্কে। কিন্তু তার গলা দিয়ে বেরিয়ে এল বিকৃত গোঙানি। সেটাই অস্পষ্টভাবে কানে গেল ডিকের। তাকাল সে এমেলিনের দিকে। তার বিস্ফারিত দৃষ্টি দেখেই বুঝে নিল ব্যাপারটা। তবুও নিশ্চিত হবার জন্য পেছন ফিরে চাইল। আতঙ্কে আত্মা খাঁচা ছাড়ার মত হলো ডিকের। ছেড়ে দিল বৈঠা। গতি বেড়ে গেল হাত-পা ছোঁড়ার।

একটি মাত্র বৈঠা আছে নৌকোয়। হাতে তুলে নিল এমেলিন সেটা। সোজা হয়ে দাঁড়াল সে। নিচে হানা অবাক চোখে দেখছে আকাশ। বৈঠার চ্যাপ্টা তীক্ষ্ণ দিকটা পানির দিকে লক্ষ্য করে তাকাল সে প্রাণীটার দিকে। ডিকের খুব কাছে ওটা। ছুটে আসছে পানিতে আলোড়ন তুলে। তীব্রগতিতে।

'শয়তান।' দাঁতে দাঁত চেপে গাল দিল এমেলিন জীবটাকে। জীবনে লক্ষ্যস্থির করে একটা ঢিলও ছোঁড়েনি সে কোন দিন। এই মুহূর্তে তীরের মত ছুটে গেল বৈঠাটা তার হাত থেকে। ঠক করে বাড়ি মারল হাঙরটাকে। থমকে দাঁড়াল হিংস্র প্রাণীটা। ভয় পেয়েছে একটু। ওর ভাববার সময়টিতে লাফিয়ে নৌকোয় উঠে

পড়ল ডিক।

একটা বৈঠাও নেই নৌকোয়।

মাত্র পাঁচ-ছ'গজ দূরে ভাসছে বৈঠাটা। ওটাকে উদ্ধার করতে গেলে জলে নামতে হবে আবার। দানব হাঙ্গরটার ছায়া দেখতে পাওয়া যাচ্ছে নৌকোর ডান দিকে। সমান দূরত্ব রেখে ভাসমান নৌকোটার সাথে সাথে চলছে শয়তানটা। তার পিঠ চকচক করছে রোদ লেগে। ধীর, স্থির, অথচ নির্দিষ্ট গতিতে শিকারকে অনুসরণ করে চলেছে সে।

নৌকোর বৈঠার উপর কোকো, যেন দাঁড়ে বসে আছে পাখি, তার নিজস্ব চেতনা দিয়ে এই তিনটি প্রাণীর বিপদ বুঝতে পারল। সে শূন্যে উঠে পড়ল হঠাৎ। একটা চক্কর দিল। আবার বসে পড়ল বৈঠাতে, ঝাপ্টাতে লাগল তার ডানার পালকগুলো অস্থিরভাবে।

হতাশ, অসহায় ডিক নৌকোর উপর দাঁড়িয়ে নিজের মাথার চুল ছিঁড়তে লাগল। তার চোখের সামনে দূর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে তীরভূমি। সমুদ্রের গর্জন ভেসে আসছে কানে। কিন্তু কিছুই করার নেই তার। সমুদ্রের বিশাল থাবা ওদের টেনে নিয়ে যাচ্ছে দ্বীপ থেকে।

তারপর হঠাৎই, ছোট নৌকোটা তীব্র গতিতে ছুটে গেল সাগরের দিকে। যেন দৌড় প্রতিযোগিতায় নেমেছে। লেগুনের দু'পাশে জোয়ারের জল মিলিত হয়ে এবার ছুটে চলেছে সাগর-সঙ্গমে। বন্ধ দুয়ার খুলে গেলে যেমন ভাবে ভেতরের শব্দ তীব্রভাবে ছুটে আসে, ঢেউ-এর গর্জন তেমনি প্রচণ্ড ভাবে বাজতে লাগল ওদের কানে। উত্তাল ঢেউ ছুটে আসছে দুরন্ত বেগে পাথরের ওপর, টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। সী-গালগুলো কর্কশ স্বরে চিৎকার জুড়েছে ওদের মাথার ওপর। এক মুহূর্তের জন্য মনে হলো ইতস্তত করছে সমুদ্র। ওদের আছড়ে ফেলবে প্রবাল স্তূপে, না টেনে নিয়ে যাবে সীমাহীন সমুদ্রে, ভাবছে

যেন।

সমুদ্রের এই দোটানা মনোভাব ক্ষণিকের জন্য স্থায়ী হলো। তারপরই জোয়ারের শক্তি হার মানল সমুদ্রের প্রসারিত থাবার কাছে। স্রোত এসে ওদের টেনে নিয়ে ফেলল সাগরে।

নৌকার মাঝখানে এমেলিন। বুকের ভেতর আঁকড়ে ধরে বসে আছে ছোট্ট হানাকে নিয়ে। ডিক বসে পড়ল ধপ করে তার পাশে। আর পাখিটা, তার অনুভূতিশক্তি দিয়ে বুঝল কি বিপদ সামনে। বাতাসে ভেসে উঠল কোকো। ভাসমান নৌকোটার চারপাশে তিনবার চক্কর কাটল। তারপরই সব দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলে উড়াল দিল তীরের দিকে।

আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল দ্বীপটা ওদের চোখের সামনে থেকে।

এই সেই দ্বীপ, যে তৈরি করেছে লক্ষ কোটি প্রবালের মৃতদেহ। উপকথার সাথে জড়িত এই কীটগুলো তাদের আশ্চর্য প্রতিভা নিয়ে কত না দ্বীপ গড়েছে বিক্ষুব্ধ, তরঙ্গায়িত সাগরের বুকের ওপর। এদের নিরলস পরিশ্রম সকলের প্রশংসা পাবার যোগ্য। কত ধীর গতিতে, বছরের পর বছর ধরে এই অবহেলিত সামুদ্রিক প্রাণীগুলো দ্বীপ, আর দ্বীপের খাঁড়িগুলো গড়েছে। এই ভবঘুরেদের যেন বেঁচে থাকারও কোন সাধ নেই। এই মন্থর আঠাল প্রাণীরা সমুদ্রের ক্যালসিয়াম অংশের সাথে দানা বেঁধে ঘর বাঁধে। জমতে থাকে মৃত্যুর পরোয়ানা হাতে নিয়ে।

এই প্রাণীগুলো, বিজ্ঞানের পরিভাষায় যাকে বলে 'পলি পাইফার,' তাদের দেহকে অপ্রয়োজনীয় মনে করে যুগ যুগ ধরে তৈরি করে প্রবালের দ্বীপ। দ্বীপগুলোকে দেখলে মনে হবে শক্ত পাথরের তৈরি। কিন্তু তা নয়। সমুদ্র গর্ভ থেকে জেগে ওঠে প্রবালের প্রাচীর। ওরা মৃত নয়। বলা চলে অর্ধমৃত। যদি তাই না হত তবে সমুদ্রের আক্ষেপ দশ বছরও টিকে থাকতে পারত না।

জীবন্ত কীটগুলো থাকে ভিতরে। এই পাথরগড়া কারিগরগুলো অবশ্য জলের সংস্পর্শ ছেড়ে দিলে আর সূর্যের আলো লাগলেই মরে যায়। ভাটার সময় যদি কেউ সাহস করে এখানে আসতে পারে, তবে দেখতে পাওয়া যাবে বিশাল স্তূপীকৃত পাথরের আকারে কীটগুলোকে। মৌচাকের মত আকার এদের। ভেতরে জীবন্ত প্রবালকীট গিজ গিজ করছে। মাছেদের চমৎকার খাদ্য, সমুদ্রের প্রবল ঝাঁকুনি নিয়েই এদের জন্ম ও মৃত্যু। ওরা মরে, সমুদ্রের ঝড় ওদের কখনও টুকরো টুকরো করে দেয়। একটি প্রাণীর অবলুপ্তি হলে আর একটি এসে ভরিয়ে দেয় তার জায়গাটা। পূরণ করে নেয় শূন্যস্থান।

পৃথিবীর বহু সামুদ্রিক অঞ্চলে বহু বছর ধরে গড়ে উঠেছে প্রবাল প্রাচীরবেষ্টিত দ্বীপ। রিমস্কি কোরসাকোফ এমন একটি প্রবাল দ্বীপ যা লম্বায় চুয়ান্ন মাইল আর চওড়ায় কুড়ি মাইল। এই দ্বীপটি জীবন্ত। ভাঙছে, গড়ছে। এই সব প্রবাল দ্বীপে ধীরে ধীরে উদ্ভিদ জন্মায়, শান্ত লেগুনের নিচে তৈরি হয় আশ্চর্য 'জলের বাগান'। প্রাকৃতিক কারণেই ছুটে আসে আরও অনেক প্রাণী। গাছে গাছে বাসা বাঁধে পাখিরা। তৈরি হয় রহস্যময়ী প্রকৃতির হাতে গড়া বিচিত্র জীবন্ত দ্বীপ।

ওরা চলে যাচ্ছে এই দ্বীপ ছেড়ে। ডিক, এমেলিন আর হানা। একদিন দুটি শিশুকে আশ্রয় দিয়েছিল এই দ্বীপ পরম নির্ভরতায়। গড়ে উঠতে দিয়েছিল তার নিজস্ব নগ্ন সৌন্দর্য দিয়ে। ওদের জীবনে এসেছিল প্রেম, সুখ, শান্তি। সবকিছু পেয়েছিল ওরা। চলে যেতে হচ্ছে আজ তাদের। স্বেচ্ছায় নয়। এক ভয়ঙ্কর অঘটনের মধ্যে ছুটে চলেছে ওরা–গভীর, বিশাল সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের মাঝ দিয়ে।

বেলা গেল। দিগন্তে দ্বীপটির ঝাপসা সবুজ আভাস দেখা যাচ্ছে। সন্ধ্যা এল। চাঁদ ওঠেনি এখনও। ভাসতে ভাসতে চলেছে নৌকা। প্রদোষের আলোয় তারারা উঁকি দিচ্ছে একে একে। নিঃসঙ্গ ডিঙিটা। তিনজন যাত্রী।

হানাকে বুকের ভেতর জড়িয়ে ডিকের কাঁধে মাথা রেখে শুয়ে আছে এমেলিন। দুজনেই নীরব। বাক্যহারা। দ্বীপের সমস্ত সুখ, শান্তি ছেড়ে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে ওদের ঈশ্বর ওরা জানে না। মন শান্ত হয়ে গেছে। নাহ্, কোন দুঃখ নেই, নেই ভয়। এক সঙ্গেই তো আছে ওরা। যাই আসুক, পৃথিবীর কোন শক্তি আর বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না ওদের। আরও ঘনিষ্ঠ হলো ওরা। চেয়ে থাকল দু'জন দু'জনের দিকে। দু'জোড়া ঠোঁট এগিয়ে এল। পরস্পরের দিকে। আকাশের কালো গালিচায় অসংখ্য তারা। হাসছে মিটিমিটি।

তিনদিন পর।

নৌকো চলেছে। ঘুমিয়ে পড়েছে ওরা। এমেলিনের হাতে রহস্যময় সেই ডাল। নৌকার খোল থেকে তুলে নিয়েছে। গাঢ় লাল রঙের কুঁচ ফল। ডালের সঙ্গে লেগে রয়েছে থোকা থোকা ফলগুলো। যে ফল খেলে ঘুম আসবে। আর ভাঙবে না।

AMARBOI.COM

সাত

'আপনি বোধহয় স্বপ্ন অথবা ভবিষ্যৎ-দর্শনের অলৌকিকতায়

বিশ্বাস রাখেন না?' লেস্ট্রেঞ্জ হঠাৎ শুধালেন কথাটা ক্যাপ্টেন স্ট্যানিস্ট্রিটকে। পায়চারি করছেন তিনি। দৃষ্টি তাঁর ডেকের পাটাতনের দিকে। দু'হাত পেছনে। পড়ন্ত বিকেল। প্রশান্ত মহাসাগর। দক্ষিণ সমুদ্র। ভাসছে স্কুনার 'রারাটোঙ্গা'।

'জানলেন কি করে আপনি?' স্ট্যানিস্ট্রিট অবাক হলেন।

'ধারণা করলাম আন্দাজের ওপর।' হাসলেন লেস্ট্রেঞ্জ। 'অধিকাংশ লোকই তো বিশ্বাস করে না এসব।'

'তা ঠিক। কিন্তু বহু লোক আবার বিশ্বাস করে প্রবলভাবে।'

লেস্ট্রেঞ্জ কথা বললেন না কয়েক মুহূর্ত। ভাবছেন। খানিকক্ষণ পর বললেন, 'আপনি তো আমার সব কথাই জেনেছেন। আমার দুঃখ কষ্টের কথা বলে বিব্রত করতে চাই না আপনাকে। কিন্তু ক'দিন ধরেই একটা জিনিস গভীরভাবে অনুভব করছি আমি। মনে হচ্ছে যেন স্বপ্ন দেখছি জেগে জেগে।'

'ইজ্ ইট্?' নিখাদ কৌতূহল স্ট্যানিস্ট্রিটের কণ্ঠে।

'আমি ঠিক ব্যাখ্যা করতে পারছি না। এমন কিছু আমি দেখি যা আমার বুদ্ধির বাইরে। ধারণার অতীত।'

'ঠিক কি বলতে চাইছেন পরিষ্কার করুন তো।'

'ব্যাপারটা অদ্ভুত।' লেস্ট্রেঞ্জ বললেন, 'আমার বয়স এখন পঞ্চাশ। অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি এ সময়টুকুতে। একজন মানুষের পক্ষে সাধারণ ইন্দ্রিয়গত চেতনা যতটুকু পাবার, তা পেয়েছি। কিন্তু অসাধারণ কতগুলো জিনিস আমি চেতনার গভীরে দেখতে পাই। কখনও-সখনও। বিজলি চমকের মত।'

'যেমন?' একটু যেন আগ্রহী হয়ে উঠেছেন স্ট্যানিস্ট্রিট।

'ধরুন একটু আগে, শুয়ে ছিলাম আমি। কাঁদতে দেখলাম তাকে!'

'কাকে!'

'একটা শিশু! কাঁদছে! অসহায়!'

'কোথায়?'

'আমার চোখের সামনেই। ক'দিন থেকেই। হঠাৎ যেন ঝড়ো হাওয়া লেগে খুলে গেছে একটা বন্ধ দুয়ার। এক ঝলক আলো এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আমি দেখছি উত্তাল তরঙ্গের মাঝে নিঃসঙ্গ একটা ডিঙ্গি। তিনজন যাত্রী!'

'আচ্ছা!' স্ট্যানিস্ট্রিটের ঠোঁট বেঁকে গেছে। চোখে আবছা কৌতুক। বুঝতে পারছেন তিনি প্রলাপ বকছেন লেস্ট্রেঞ্জ। হারানো শিশুদের কথা ভাবতে ভাবতে বিকার এসে গেছে তাঁর। তবু তার ভিতরের মনোভাবটুকু প্রকাশ করলেন না। বললেন, 'তারপর?'

'তারপর–,' লেস্ট্রেঞ্জের দৃষ্টি কোন্ সুদূরে। স্ট্যানিস্ট্রিটের মনের কথা পড়বার ক্ষমতা এখন নেই তাঁর। '–তারপর, দেখি মনের জানালার পর্দা সরে গেল। বাচ্চাটার কান্নার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি আমি স্পষ্ট। খিদে পেয়েছে তার। অই কাঁদছে!' গলা বুজে এল লেস্ট্রেঞ্জের কান্নার দমকে।

'আশ্চর্য!' স্ট্যানিস্ট্রিট যেন অনুভব করতে পারছেন একজন স্বজনহারা মানুষের কান্না।

'হ্যাঁ, ক্যাপ্টেন,' চোখ মুছে বললেন লেস্ট্রেঞ্জ, 'ওরা–বুঝলেন ওরা, বিপদে পড়েছে কোন। আমার–অতীন্দ্রিয় মন জানান দিচ্ছে আমাকে।'

হঠাৎ চুপ হয়ে গেলেন লেস্ট্রেঞ্জ। স্ট্যানিস্ট্রিট অস্বস্তি বোধ করছেন। লেস্ট্রেঞ্জের চোখে অশ্রু। দু'পা এগিয়ে গেলেন ক্যাপ্টেন। পিঠে হাত রাখলেন। বাচ্চা শিশুর মত ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন লেস্ট্রেঞ্জ।

আজ প্রায় হপ্তা দুই হতে চলল সাগরে ভেসেছে 'রারাটোঙ্গা'। স্ট্যানিস্ট্রিট দেখেছেন একজন মানুষ কতটুকু কাতর হতে পারেন স্বজন হারানোর শোকে। মাঝে মাঝে লেস্ট্রেঞ্জের নীরব অদ্ভুত আচরণগুলো তাঁকে ভাবিয়ে তোলে। জাহাজ যখন গতিহীন হয়ে

AMARBOI.COM

পড়ে লেস্ট্রেঞ্জ যেন পাগলপারা হয়ে ওঠেন। ডেকের রেলিঙে এমনভাবে ঝুঁকে থাকেন মনে হয় কিছু খুঁজছেন তিনি, ঝাঁপিয়ে পড়বেন বুঝি। হাত ধরে টেনে নিয়ে আসেন তিনি। সান্ত্বনা দেন। ঘুমোতে বলেন। আটদিনে এই লোকটিকে তিনি ঘুমোতে দেখেননি। বিছানায় শুয়েও চোখ খোলা। কি যেন ভাবছেন।

ক্যাপ্টেন সাইমন জে. ফাউন্টেন বিছানায় শুয়ে শুয়েই এই অনুসন্ধান-যাত্রার এমন নিখুঁত ও সুন্দর ব্যবস্থা করে দিল যে অন্যান্য নাবিক, প্রয়োজনীয় রসদ-পত্রসহ ক্যাপ্টেন স্ট্যানিস্ট্রিটের পরিচালনায় 'রারাটোঙ্গা' স্কুনার জাহাজটি মে মাসের দশ তারিখে গোল্ডেন গেট পার হয়ে পৌঁছে গেল দক্ষিণ সমুদ্রে। বলাই বাহুল্য লেস্ট্রেঞ্জ এই জাহাজের প্রধান যাত্রী।

যদি কেউ স্কুনার জাহাজে চড়ে থাকে, তবে তার জানাই আছে যে এই জাহাজটির সঙ্গে অন্য জলযানের কত পার্থক্য। স্কুনারের বিশাল চওড়া আর আকাশ ছোঁয়া পাল বাতাসের সকল সুবিধা আদায় করে নেয়। অন্যান্য দ্রুতগামী জলযানের তুলনায় স্কুনার হলো জাহাজের রাণী। চৌকো জাহাজ। ঢেউয়ের তালে তালে লাফিয়ে চলে। কোন তুলনাই হয় না। আর 'রারাটোঙ্গা'র সমুদ্র যাত্রার সুখ্যাতি ও প্রাধান্য প্রশান্ত মহাসাগরের যত স্কুনার জাহাজ আছে—স্বীকার করে নিয়েছে সবাই।

প্রথম কয়েকদিন 'রারাটোঙ্গা'র দক্ষিণ-যাত্রা খুব মসৃণ হলো। তরতর করে ছুটে চলল সে। তারপর, হঠাৎই বাতাস যেন প্রাচীর তুলে ফেলল। থেমে গেল গতি।

স্কুনারের ভেতর লেস্ট্রেঞ্জ অস্থির, উত্তেজিত। জাহাজের গতি থেমে যাওয়াতেই, উদ্বেগে পায়চারি করছেন তিনি। 'ওরা খুব বিপদে পড়েছে, খুব বিপদে—' কে যেন ফিসফিসিয়ে উঠল ওঁর কানের কাছে। অসহায়ের মত সমুদ্রের দিকে তাকালেন তিনি।

জাহাজটা বলতে গেলে প্রায় থেমে আছে। ভেতরটা হু হু করে জ্বলে উঠল লেস্ট্রেঞ্জের। এক আগুনে পুড়েছেন তিনি অনেক বছর ধরে। এ আগুনে জ্বালা আছে দাহ নেই।

কয়েকটা দিন কেটে গেল একইভাবে। তারপর ভাগ্যদেবী যেন ফিরিয়ে নিল তার বিরূপ মনোভাব। বাতাসে ফিরে এল স্বচ্ছন্দ গতি। স্কুনারের পাল, দড়িদড়াগুলো যেন আনন্দে গান গাইতে লাগল আবার। দ্রুতগতিতে ছুটছে 'রারাটোঙ্গা'। নিচে পিছলে যাচ্ছে পানি। তার শব্দ ভেসে আসছে লেস্ট্রেঞ্জের কানে। চোখে-মুখে খুশির ছোঁয়া লাগল তাঁর। জাহাজের পেছনে তাকালেন তিনি। অসংখ্য ফেনারাশি চলছে জাহাজের পিছু পিছু ভক্ত অনুরাগীর মত।

পাঁচশো মাইল একভাবে চলল 'রারাটোঙ্গা'। তারপর হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল তার গতি। সাগর আর বাতাস নিথর হয়ে গেল আচমকা। বিবর্ণ নীল আকাশ ঝুলে রইল গম্বুজের মত স্কুনারের মাথার ওপর। শুধু দূর দিগন্তে যেখানে আকাশ আর সাগর কানাকানি করে, সেখানে স্তম্ভের আকারে কয়েক টুকরো মেঘ রয়েছে ঘিরে। মনে হয় একটা শক্ত চত্বরে দাঁড়িয়ে আছে স্কুনারটা। একটা দুটো জলের বুড়বুড়ি চাতালের মত সমান পানির বুককে ভেঙে দিচ্ছে মাঝে-সাঝে। বাতাস একেবারে চুপ। স্তব্ধ সাগর। স্কুনারের পাশে সামুদ্রিক আগাছা উঁকি দিয়েই মিলিয়ে যাচ্ছে আবার।

তিনদিনের মাথায় বইল বাতাস। দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে। প্রতিটি পাল আকাশে উড়ল রারাটোঙ্গার। স্কুনারের তলায় জলের গান শুনতে পেলেন লেস্ট্রেঞ্জ।

নিজের কাজে ক্যাপ্টেন স্ট্যানিস্ট্রিট একজন প্রতিভাধর মানুষ। ইচ্ছে করলেই জলে ভাসমান যে কোন জাহাজের চেয়ে বেশি স্পীড আনতে পারেন তিনি। প্রয়োজনের অতিরিক্ত পাল খাটালেন তিনি

স্কুনারে। লেস্ট্রেঞ্জের সৌভাগ্যই বলতে হবে, এই ক্যাপ্টেন একজন শিক্ষিত ও অত্যন্ত মার্জিত রুচিসম্পন্ন ব্যক্তি।

'আমি এভাবে কথা বলছি দেখে আপনি হয়তো–,' একবার চোখ তুলে তাকালেন লেস্ট্রেঞ্জ স্ট্যানিস্ট্রিটের দিকে। কথা বলতে শুরু করেছেন তিনি আবার, '–আপনি হয়তো ভাবছেন মাথার বিকার হয়েছে আমার।'

'নো, নো। আপনি বলেন। মন খুলে কথা বলেন,' স্ট্যানিস্ট্রিট সহানুভূতিভরে ওঁর কাঁধে হাত রাখলেন।

'যাক, ওসব কথা এখন থাকুক। স্বপ্ন, অশুভ সঙ্কেত, এসব ভুলে গিয়ে বাস্তবে আসা যাক। আপনি জানেন কিভাবে হারিয়েছি আমি শিশু দু'টিকে। এবং একথাও জানেন ক্যাপ্টেন ফাউন্টেনের চিহ্নিত স্থানে ওদের ফিরে পাবার কত আশা রাখি। ক্যাপ্টেন অবশ্য একটা কথা বলেছিলেন, দ্বীপটা জনবসতিহীন। কিন্তু নিশ্চিত নন তিনি। তাড়াহুড়োয় চলে এসেছিলেন। হয়তো দ্বীপের কোথাও ছিল লোকজন।'

'উনি শুধু সৈকতের কথা বলেছিলেন। পুরো দ্বীপ ঘুরে দেখেননি।' লেস্ট্রেঞ্জের আশায় ইন্ধন জোগালেন স্ট্যানিস্ট্রিট।

'ইউ আর রাইট। ধরুন দ্বীপের অন্য অংশে আদিবাসীরা থাকে। তারা শিশু দুটোকে নিয়েও যেতে পারে।'

'তাই যদি হয়ে থাকে, তা হলে আদিবাসীদের মধ্যেই বড় হয়ে উঠবে ওরা।'

'তাহলে তো ওরা বুনো হয়ে যেতে পারে।'

'কথাটা মিথ্যে বলেননি।' স্ট্যানিস্ট্রিট বললেন, 'সত্যি বলতে পলিনেশিয়ানদের সম্পর্কে যদ্দূর জানি ওরা সম্পূর্ণ বন্য বা বর্বর নয়। বহুবার আমি তাদের মধ্যে গিয়েছি। আর কানাকারা আমাদের মত সাদা চামড়ার। এখন প্রায় দ্বীপগুলোই সভ্য দেশের

মত। কিছু দ্বীপ অবশ্য আদিম স্তরেই পড়ে আছে একথাও ঠিক। তবু, যদি ওরা নিয়ে গিয়ে থাকে শিশুদের–'

লেস্ট্রেঞ্জের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল।

'তাহলে?' ওঁর স্বরে উৎকণ্ঠা।

'তাহলে আর কি? ভাল ব্যবহারই পাবে ওরা আদিবাসীদের কাছে।'

'আর গড়ে উঠবে বুনোদের মত?'

'মনে হয়।'

দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ফেললেন লেস্ট্রেঞ্জ।

'দেখুন, এসব কিন্তু কথার কথা।' ক্যাপ্টেন স্ট্যানিস্ট্রিট বললেন, 'আমি অবশ্য অন্য কথা ভাবছি। আমরা, সভ্য লোকেরা, নিজেদের সভ্য বলে গর্ব করি, শ্রেষ্ঠত্বের ভান করি আর করুণা করি ওই বন্যদের। কিন্তু সত্যিকার সুখ আমরা কি পেয়েছি?'

'কি বলতে চাচ্ছেন?'

'ওরা বুনো হলেও সুখী।'

'কিভাবে বুঝলেন?'

'উষ্ণ আবহাওয়ায় একজন নগ্ন বর্বরের থেকে বেশি সুখী আর কে হতে পারে?'

'ভাল বলেছেন।'

'হ্যাঁ, মুক্ত জীবন যাপন করছে ওরা।'

'সূর্য ওঠার আগে নক্ষত্রের আলোয় জেগে ওঠে ওরা। অস্ত গেলে ঘুমোতে যায়। বুক ভরে টেনে নিচ্ছে মুক্ত হাওয়া–' লেস্ট্রেঞ্জের দৃষ্টি যেন কোন্ সুদূরে। আচ্ছন্নের মত কথা বলছেন তিনি, 'ওরা···ওরা যদি ওই ভাবেই গড়ে ওঠে, তবে সেখান থেকে ওদের ছিনিয়ে নিয়ে সভ্যতায় ফিরিয়ে আনাটা হবে নিষ্ঠুরতা, এক ধরনের অবিচার।'

'আমারও তাই মনে হয়,' বললেন স্ট্যানিস্ট্রিট। আর কথা

AMARBOI.COM

বললেন না লেস্ট্রেঞ্জ। পায়চারি শুরু করলেন আবার। তাঁর চিবুক ছুঁয়েছে বুক। সূর্য ডুবল। গোধূলির আঁধার।

'নির্দিষ্ট দ্বীপটি থেকে এখনও দুশো চল্লিশ মাইল দূরে রয়েছি আমরা,' বললেন ক্যাপ্টেন স্ট্যানিস্ট্রিট। 'স্কুনার ঘণ্টায় দশ নট ছুটছে। হিসেব মত কাল দুপুর নাগাদ পৌঁছে যাব আমরা।'

'ক্যাপ্টেন!' স্ট্যানিস্ট্রিট অবাক হয়ে দেখলেন লেস্ট্রেঞ্জ বুকে হাত দিয়ে খামচে ধরেছেন।

'কি হয়েছে, স্যার?' ছুটে এলেন স্ট্যানিস্ট্রিট। ধরার আগেই পড়ে গেলেন লেস্ট্রেঞ্জ ডেকের ওপর ধপ্ করে। মাথা ঠুকে যাবার আগেই ধরে ফেললেন ওঁকে স্ট্যানিস্ট্রিট দু'হাতে।

'কিছু হয়েছে ওদের।' চোখ বুজে ফিসফিসিয়ে উঠলেন লেস্ট্রেঞ্জ। এবং জ্ঞান হারালেন।

নতুন সকাল।

গতরাতে অনুকূল বাতাস পেয়ে 'রারাটোঙ্গা' অনেক দূর এগিয়েছে। শেষরাতে অবশ্য বাতাস পড়ে গেল। এখন ধুঁকে ধুঁকে এগুচ্ছে স্কুনারটা। লেস্ট্রেঞ্জের সাথে কথা বলতে বলতে স্ট্যানিস্ট্রিট স্কুনারের শেষ অংশে চলে এসেছেন। মাস্তুলের কাছে দাঁড়িয়ে সূর্যের আলো থেকে চোখ বাঁচানোর আশায় কপালে হাত রেখে কি যেন দেখছেন তিনি।

মাঝরাতে জ্ঞান ফিরেছিল লেস্ট্রেঞ্জের। ফ্যাকাসে হয়ে আছে মুখ। গর্তে বসে গেছে চোখ দুটো। কেমন যেন দিশেহারার মত ভাব তাঁর। দেখেশুনে ঘাবড়ে গেছেন স্ট্যানিস্ট্রিট।

'আরে!' সাগরের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে চমকে উঠলেন স্ট্যানিস্ট্রিট। লেস্ট্রেঞ্জ শব্দটা পেয়ে চলে এলেন এদিকে।

'কি দেখছেন?'

AMARBOI.COM

'একটা ডিঙি!' স্ট্যানিস্ট্রিট বললেন, 'দূরবীনটা দিন তো একটু।'

ঝপ্ করে নাকের কাছে চলে এল ডিঙিটা দূরবীনটা চোখে লাগাতেই। অনেকক্ষণ চেয়ে রইলেন স্ট্যানিস্ট্রিট ওদিকে।

'একটা নৌকা! ছোট্ট একটা নৌকা দেখতে পাচ্ছি!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন স্ট্যানিস্ট্রিট। 'কিন্তু ওটার ভেতর কি আছে দেখতে পাচ্ছি না।' স্টিয়ারিং হুইলের লোকটির দিকে চেয়ে বললেন, 'এই–জাহাজটাকে ডান দিকে রেখে চলো।'

'নৌকাটাতে লোক আছে কি?' লেস্ট্রেঞ্জ শুধালেন অস্থির কণ্ঠে।

'ঠিক বলতে পারছি না। শিকারের নৌকাটা নামিয়ে ওটার কাছে যেতে হবে একবার।'

বাদামের খোসার মত ভাসছে নৌকাটা বিশাল সমুদ্রে। তিমি শিকারী নৌকোটা গা ঘেঁষে দাঁড়াল ওটার। ডিঙির খোলের ভেতর একটি মেয়ে। কয়েক ফালি রঙিন কাপড়ের টুকরো গায়ে। একটি শিশু। শুয়ে আছে পুরুষ সাথীর হাতের মাঝে জড়িয়ে। মনে হয় আদিবাসী। মেয়েটির হাতে একটা গাছের শুকনো ডাল।

একটি ফলও নেই তাতে।

'ওরা কি বেঁচে আছে?' নৌকা থেকে ঝুঁকে দেখছিলেন লেস্ট্রেঞ্জ। জিজ্ঞেস করলেন।

স্ট্যানিস্ট্রিট চুপ।

***

AMARBOI.COM